মায়া-মালঞ্চ

লেখকের 'কালো হাওয়া' উপন্যাস

অবলম্বনে

তিন অঙ্কে সমাপ্ত নাটক

কবিতাভবন ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
থেকে বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক প্রকাশিত

মায়া-মালঞ্চ **বুদ্ধদেব বসু**

প্রথম প্রকাশ
১৯ ফাল্গুন ১৩৫০
৩ মার্চ ১৯৪৪

দাম ১৷৷০

প্রচ্ছদপট : যামিনী রায়

১ থেকে ৮০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ভারত প্রেস, ১৪ ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও অবশিষ্ট অংশ
১৮ নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ দি ইস্টার্ন টাইপ ফাউণ্ডারি এণ্ড ওরিয়েণ্টাল
প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিঃ থেকে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে, বি. এস-সি কর্তৃক মুদ্রিত।

মায়া-মালঞ্চ

বুদ্ধদেব বসু

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা

পাত্র-পাত্রী

মহামায়া	
মহাদেব	
অরিন্দম	
হৈমন্তী	তাঁর স্ত্রী
মিনি	তাঁর বড়ো মেয়ে
বুলি	তাঁর ছোটো মেয়ে
অরুণ	তাঁর ছেলে
উজ্জ্বলা	অরুণের স্ত্রী
নিরঞ্জন	অরুণের কলেজদিনের বন্ধু
নীরদ ডাক্তার	অরিন্দমের বন্ধু

স্থান—কলকাতা

সময়—১৯৩৮

'মায়া-মালঞ্চের' প্রথম খসড়া লিখেছিলাম ১৯৪৩-এর গ্রীষ্মে, তারপর পরিবর্তন ও পরিবর্জনের কারখানাঘরে বার-বার মেরামত হ'য়ে এর হ্রস্বতম ঠিক-তিন-ঘণ্টার-মধ্যে অভিনয়োপযোগী রূপটি তৈরি হয়েছিলো ঐ বছরেরই শেষের দিকে। মুদ্রিত বইটি নাটকের হ্রস্বতম পাঠ। যদি কোনো পেশাদার বা শৌখিন সম্প্রদায় এটি অভিনয় করেন, বইয়ের একটি কথাও যেন বাদ না দেন, বিশেষভাবে এই অনুরোধ জানাচ্ছি।

সংশোধন

বইয়ের ৮৪ পৃষ্ঠায় নিরঞ্জনের 'আমি কাপুরুষ!...তুমি—তুমি ভুলো না।' উক্তির পরে বুলির মুখে নিচের কথাটি পড়তে হবে:

বুলি। আমি ভুলবো!

৯ পৃষ্ঠায় মিনি বলছে: 'বুলি, ফের আবার এ-রকম কথা বলবি তো তোকে আর আস্ত রাখবো না।' এখানে **'ফের আবার'**-এর বদলে **'ফের'** পড়তে হবে।

কবিতাভবনের প্রযোজনায় ৩ মার্চ, ১৯৪৪ তারিখে শ্রীরঙ্গম নাট্যভবনে 'মায়া-মালঞ্চ' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম রজনীর ভূমিকালিপি নিচে দেয়া হ'লো :

মহামায়া	কল্যাণী মুখোপাধ্যায়
মহাদেব	শেখর সেন
অরিন্দম	রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরী
হৈমন্তী	লীলা দাশগুপ্তা
মিনি	প্রতিভা বসু
বুলি	তপতী দেবী চট্টোপাধ্যায়
অরুণ	পরিতোষ সোম
উজ্জ্বলা	উমা দত্ত
নিরঞ্জন	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
নীরদ ডাক্তার	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

'মায়া-মালঞ্চে'র অভিনয়ব্যাপারে শ্রীযুক্ত সৌরেন সেনের কাছ থেকে যে-অকুণ্ঠ সহায়তা পেয়েছি, এখানে তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

উৎসর্গ

রমা

'ভুলিবো না'—এত বড়ো স্পর্ধিত শপথে
জীবন করে না ক্ষমা। তাই মিথ্যা অঙ্গীকার থাক।
তোমার চরম মুক্তি, হে ক্ষণিকা, অকল্পিত পথে
ব্যাপ্ত হোক। তোমার মুখশ্রী-মায়া মিলাক, মিলাক
তৃণেপত্রে, ঋতুরঙ্গে, জলে-স্থলে, আকাশের নীলে।
শুধু এই কথাটুকু হৃদয়ের নিভৃত আলোতে
জ্বেলে রাখি এই রাত্রে—তুমি ছিলে, তবু তুমি ছিলে

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[অরিন্দমের বালিগঞ্জের বাড়ির ড্রয়িংরুম। আসবাবপত্র প্রচুর ও প্রথম শ্রেণীর। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এক কোণে দাঁড়ানো একটা চৌকো টেবিল, সেখানে ইংরেজি বাংলা সচিত্র পত্রিকার স্তূপ।

বর্ষাকালে এক অপরাহ্ণে এই নাটকের যবনিকা উঠলো।

একটা সোফায় গা-এলানো আধো-শোয়া অবস্থায় বুলিকে দেখা গেলো। আঠারো পেরিয়েছে। পরনে একখানা রঙিন তাঁতের শাড়ি, শাড়িখানা দামি কিন্তু আগোছালোভাবে পরা। কানে, গলায় কোনো গয়না নেই। হাতে কয়েকগাছা কাচের চুড়ি। চুল উসকোখুসকো। সব মিলিয়ে কেমন একটা এলোমেলো ভাব। দেখে বোঝা যায়, ছেলেমানুষির ভাবটা এখনো ওর দেহ-মনকে ঘিরে আছে। এমনকি, নখ খাবার অভ্যেসটা এখনো ছাড়তে পারেনি। আপাতত বাঁ হাতের নখ খাচ্ছে আর একটা সচিত্র পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে।

একটু পরে ভিতরের দরজা দিয়ে ঢুকলো মিনি আর হৈমন্তী। মিনিরও বেশভূষায় চটক নেই, কিন্তু বুলির মতো সে স্বভাবতই যত্নহীন নয়, বরং সযত্নে উদাসীন। মুখশ্রী বিষণ্নরকম মধুর। কালো পাড়ের শাদা মিলের শাড়ি পরেছে, লম্বা কালো চুল পিঠের উপর খোলা, শাড়ির আঁচলটি চাদরের মতো গায়ে জড়ানো। এই আঁচল বার-বার অকারণেই বুকের উপর দিয়ে টেনে দেয়া তার একটা অভ্যেস। বয়স বাইশের কাছাকাছি। হাতে দুটি সরু সোনার রুলি ছাড়া আর কোনো গয়না নেই।

প্রথম দৃশ্য

হৈমন্তী চল্লিশ ছুঁয়েছেন কিন্তু দেহটি ছিপছিপে সুরক্ষিত, হঠাৎ দেখলে পঁচিশ ব'লে ভ্রম হয়। অত্যন্ত মূল্যবান একখানা গরদের শাড়ি সুন্দর ক'রে পরেছেন, তাঁর চুলও খোলা এবং প্রায় মিনির চুলের মতোই লম্বা। গলায় সরু হার চিকচিক করছে, আঙুলে সবুজ-পাথর-বসানো আংটি। তাঁর চেহারায় চালচলনে এমন একটা কিছু আছে যার জন্য তাঁকে দেখলেই বিশেষ কেউ ব'লে মনে হয়।]

হৈমন্তী (এগিয়ে আসতে আসতে)। তাহ'লে তোর উপরেই সব ভার রইলো, মিনি।

মিনি। কিছু ভেবো না, মা।

হৈমন্তী। তোর বাবাকে কী বলবি মনে আছে তো?

মিনি। আছে।

হৈমন্তী। আমার ফিরতে রাত হতে পারে। ওঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা ভালোমতো করিস।

মিনি। তোমার কি খুব রাত হবে, না?

হৈমন্তী। কী ক'রে বলি।

বুলি (সচিত্র পত্রিকা থেকে চোখ তুলে—হঠাৎ)। মা, তুমি আজও মায়া-মালঞ্চে যাচ্ছো!

হৈমন্তী (ছোটো মেয়ের কথার জবাব না দিয়ে—মিনিকে)। তাহ'লে আমি চলি। গাড়িটা বের করেছে তো?

বুলি (তীব্রস্বরে)। মা, তুমি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছো! বাবাকে আনতে গাড়ি পাঠাবে না?

মিনি (শান্তস্বরে)। বাবা ট্যাক্সিতেই আসবেন।

বুলি (হাতের পত্রিকা রেখে দিয়ে—খাড়া হয়ে ব'সে)। মা, বাবা আজ আসবেন, একটু পরেই এসে পড়বেন—আর তুমি বেরিয়ে যাচ্ছো!

হৈমন্তী (যেতে-যেতে বাইরের দরজার কাছে এক পলক দাঁড়িয়ে—

ছোটো মেয়ের দিকে ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকিয়ে)। দেখতেই তো পাচ্ছিস।

(বেরিয়ে গেলেন)

বুলি (এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে)। অন্যায়! অন্যায়! অত্যন্ত অন্যায়! আজ আট মাস পর বাবা বাড়ি আসবেন, আর মা কিনা ঠিক তাঁর আসবার মুখে বেরিয়ে গেলেন! গাড়িটা পর্যন্ত স্টেশনে পাঠালেন না! কেন, একদিন মায়া-মালঞ্চে না-গেলে কী হয়?

মিনি। কী হয় তা তো তুই বুঝবিনে, বুলি।

বুলি। তুই বোধ হয় সবই বুঝে ফেলেছিস? আচ্ছা, তুই-ই বল, মা কি ইচ্ছে করলে আজ একটা দিন বাড়ি থাকতে পারতেন না? না-হয় সন্ধেবেলাই যেতেন, তবু তো বাবার সঙ্গে দেখা হতো!

মিনি। বাবার সঙ্গে দেখা হ'লে হয়তো তাঁর যাওয়াই হতো না।

বুলি। ও, তাই বুঝি আগেই পালালেন! কী যেন বাপু, এ-সব আমার মাথায় ঢোকে না। স্বামী বিদেশে থাকলে স্ত্রী তাঁকে দেখবার জন্যেই পাগল হ'য়ে থাকে—এই তো আমি জানি।

মিনি (তীব্রস্বরে)। বুলি, তুই বড্ড ফাজিল হ'য়ে যাচ্ছিস!

বুলি। ফাজিল আবার কী! সব নভেলেই তো ও-রকম লেখে—লেখে না?

মিনি। যত রাজ্যের বাজে নভেল প'ড়ে-প'ড়ে তোর মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, বুলি।

বুলি। যাচ্ছে তো যাচ্ছে—তোর তাতে কী? আমার উপর মাষ্টারি করতে তোকে তো কেউ বলেনি। (ঠোঁট উল্টিয়ে ঝপ ক'রে সোফায় ব'সে প'ড়ে সচিত্র পত্রিকাটি আবার তুলে নিলে।)

মিনি (বুলির পাশে ব'সে—মৃদুস্বরে)। তা তোর দেখাশোনা আমি না-করলে কে আর করবে? তোর তো এখনো দায়িত্ব-জ্ঞান হয়নি।

বুলি (তীব্র শ্লেষের সুরে)। ওঃ, তাও তো বটে ! ভুলেই গিয়েছিলাম যে তুই-ই আজকাল গৃহকর্ত্রী।

মিনি (ঠাট্টা গায়ে না-মেখে, গম্ভীর সুরে)। দেখছিস তো, বাধ্য হ'য়েই আমাকে আজকাল সংসারের ভার নিতে হয়েছে। বৌদি তো তাঁর ছেলেকে নিয়েই ব্যস্ত, আর মা—

বুলি (হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে—মিনির দিকে গোল-গোল চোখ ক'রে তাকিয়ে)।—আর মা তো মা-মহামায়াতেই মগ্ন, সংসার থেকে অনেক অনে—ক উর্ধ্বে সেই স্বর্গ যেন ধূ-ধূ করছে। চোখে দূরবীন লাগালেও নাগাল পাওয়া যায় না—

মিনি (বুলির কথা শুনে মনে-মনে চটলো, কিন্তু তার বলার ধরনে হেসে না-ফেলেও পারলে না)।—আর—আর বুলি তো একটি আস্ত হনুমতী।

বুলি (ছড়া কেটে)। যদি করো অনুমতি আমি হবো হনুমতী, মারবো লেজের তাড়া, পথ ছাড়, স'রে দাঁড়া—(বলতে-বলতে উঠে দাঁড়িয়ে মেঝের উপর এক পাক ঘুরে নিলে, তার স্খলিত আঁচলটা লেজের মতোই তার পিছনে লোটাতে লাগলো।)

মিনি। অবাক করলি, বুলি ! তুই যে স্বভাবকবি হ'য়ে উঠলি !

বুলি। আমি নই কপিনী, রীতিমতো কবিনী, সে-কথাটি মনে রেখে কথা বোলো, ও মিনি ! (শেষের কথাটা ব'লে মিনির থুতনি ধ'রে নেড়ে দিলে। তারপর মিনির পাশে আবার ব'সে প'ড়ে) ভালো কথা, ক'টা বাজলো ?

মিনি (কোণের টেবিলে টাইমপীসের দিকে তাকিয়ে)। সাড়ে-চারটে।

বুলি (হাত-তালি দিয়ে)। বাবার গাড়ি এতক্ষণে হাওড়া এসে গেছে। তিনি এসে পড়লেন ব'লে।

মিনি। ততক্ষণে চেহারাটা একটু ভদ্রগোছের ক'রে রাখবি নাকি?

বুলি। আমার চেহারা—ঘ'ষে-মেজে কত আর ভালো হবে। সত্যি যদি তেমন রূপসী হতুম—

মিনি (অবজ্ঞাভরে হেসে)। রূপ? রূপ দিয়ে কী হয় রে? বরং ঘরকন্নার কাজে নিপুণ হ'লে দুটো মানুষকে সুখী করা যায়।

বুলি (কপট-গম্ভীর স্বরে)। অন্তত একজন মানুষকে সুখী করা যায় তাতে সন্দেহ নেই।

মিনি (সরলভাবে)। কার কথা বলছিস?

বুলি। সে কে তা এখনো জানিনে, তবে আশা আছে সে নিজেই একদিন এসে ধরা দেবে।

মিনি (কথাটার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে লাল হ'য়ে উঠে)। বুলি!

বুলি। কেন, এতে লজ্জার কী আছে। বিয়ে তো আমাদের একদিন হবেই।

মিনি। বুলি, বিয়ে বলতে ঠিক কী বোঝায় তা যদি তুই জানতিস—

বুলি (বাধা দিয়ে)। জানি বইকি, সবই জানি। আমাদের সুপ্রতিমবাবুর নভেলগুলো পড়লেই—

মিনি (আবেগভরে)। বুলি, জীবনটা তো নভেল নয়। বৌদির দিকে তাকিয়ে ছাখ। বিয়ের আগে—বাপের বাড়িতে—তিনি কি খুবই সুখে ছিলেন না? আর আজ—আজ তাঁর মুখের দিকে তাকানো যায় না। বিয়ে ক'রে এই তো লাভ হলো!

বুলি। সেটা কি বৌদির অপরাধ, না আমাদের দাদার?

মিনি। অপরাধী খুঁজে বের করায় তোর মতো উৎসাহ আমার নেই। সংসার এইরকমই। সংসার নরক।

বুলি (স্তম্ভিত)। সংসার নরক! আমরা সবাই নরকে ডুবে আছি?

মিনি। আছিস বই কি।

বুলি। তুই কি সত্যি-সত্যি বলতে চাস যে যারাই বিয়ে করে তারাই বৌদির মতো অসুখী?

মিনি। নিশ্চয়ই! কেউ সেটা লুকিয়ে রাখতে পারে, কেউ বা পারে না।

বুলি। মা-বাবাও তো বিয়ে করেছেন। তাঁরাও অসুখী?

মিনি। ছাখ বুলি, তুই বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস।

বুলি। বাড়াবাড়ি আবার কোথায় হ'লো? তুই বললি মানুষ বিয়ে করলেই অসুখী হয়—তাই জিগেস করলুম—

মিনি (বিহ্বলস্বরে)। আহা—মা-র মতো মানুষ কি হয়!

বুলি। কোন মা-র কথা বলছিস? তোদের মা? না, আমাদের মা?

মিনি (বুলির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে থেকে)। আমাদের মা-র কথাই বলছি। মা যে কত উঁচুদরের মানুষ তা কি তুই বুঝিস না? শিক্ষায়, শালীনতায়, রুচিতে কত উন্নত তিনি। এদিকে বাবা—বাবার কথা ভেবে ছাখ্।

বুলি। বাবার কথাই ভাবছিলুম। তিনি এসে পড়লে বাঁচি। (বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে)। ঐ যে! বাবা এসেছেন!

[বুলি দৌড়িয়ে বাইরে চ'লে গেলো। মিনি বুলির পরিত্যক্ত সোফায় দলিত কুশানগুলি পরিপাটি ক'রে গুছিয়ে রাখতে লাগলো।

বুলিকে স্কন্ধলগ্না ক'রে অরিন্দম এসে ঢুকলেন। মাঝারি লম্বা, ঠিক মানানসইরকম চওড়া, মোটা মজবুত হাড়ে পেশীবহুল মেদবর্জিত শরীর। মাথার উপরের দিকে যদিও ছোটো টাক দেখা দিয়েছে, তবু সামনের দিকে যথেষ্ট চুল, এবং সে-চুল ঘন আর বেশির ভাগ কালো। চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল সরল, গলার স্বর জোরালো, চলাফেরায় ভাবেভঙ্গিতে একটা কড়ারকমের বলশালিতা।

মোটের উপর তিনি যেন উচ্ছল অসংযত প্রাণশক্তির প্রতিমূর্তি। চেঁচিয়ে ছাড়া কথা বলেন না, হো-হো ছাড়া হাসেন না, উদ্দাম বেপরোয়া ফুর্তির রসে সব সময় মশগুল হ'য়ে আছেন—মানুষটা মনে-প্রাণে সুখী। পানাহারে, বেশভূষায়, প্রতিদিনের জীবনযাপনের সমস্ত খুঁটিনাটিতে তিনি শৌখিন, এমনকি বিলাসী। চুয়ান্ন বছর বয়সে যৌবনের জীবনোল্লাস তাঁর মধ্যে অক্ষুণ্ণ।

আপাতত তাঁর পোশাকটা অবশ্য মনোহর নয়। খাকি শর্টস্ আর ভারি বুটে মিলিটারি মহলের কেউ-কেটা মনে হয়, কোমরে চামড়ার বেল্টে একটি পিস্তলও আছে। গায়ে একটা গাঢ় নীল রঙের হাত-কাটা শার্ট। হাতের ও পায়ের যেটুকু অংশ প্রকাশ পাচ্ছে তার নিবিড় কোমলতা নয়নানন্দন নয়। চুল ফিটফাট টেড়ি-কাটা, দাড়িগোঁফ-কামানো মুখে টাটকা সতেজ ভাব, রেলগাড়িতে সাতশো মাইলের রাস্তা পেরিয়ে এসেছেন, তার ক্লান্তির চিহ্নমাত্র মুখে নেই। বেশ বোঝা যায়, রেলগাড়ির কামরাতেও তাঁর প্রসাধনের খুঁটিনাটি কিছুই অসম্পূর্ণ থাকেনি।]

অরিন্দম (বড়ো মেয়ের কাছে এগিয়ে এসে)। এই যে, ভালো তো সব ?

[একটু দ্বিধা ক'রে মিনি বাবাকে ঢিপ ক'রে প্রণাম ক'রে ফেললে।]

অরিন্দম। আরে! তুই আবার এ-সব শিখলি কবে? শ্বশুর-বাড়ির রিহার্সেল হচ্ছে বুঝি?...(ঘরের চারদিকে তাকিয়ে) তোর মা কোথায় ?

মিনি। মা—(কথাটা আরম্ভ ক'রেই থেমে গেলো)।

বুলি (মিনির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে)। না? মা এতক্ষণে যাদবপুরে পৌঁছে গেছেন ?

অরিন্দম। যাদবপুরে! সেখানে কে থাকে ?

বুলি। ওমা! তুমি দেখছি সব ভুলে গেছো, বাবা। সেই যে মা-মহামায়া—

অরিন্দম। ও, সেই ভটচায-গিন্নি! (হেসে উঠলেন) তোর মাকে বড্ড নেশায় ধরেছে—না রে? তা আজ না-হয় না-ই যেতেন।

মিনি। আজ একাদশী কি না—

অরিন্দম। একাদশীতে সধবার কী?

মিনি (চমকে চোখ তুলে—মৃদুস্বরে)। একাদশীর দিনে ওখানে উৎসব হয়।

অরিন্দম (ঠোঁট বেঁকিয়ে)। ও, উৎসব হয়!

মিনি (তাড়াতাড়ি)। তোমাকে এক্ষুনি এক পেয়ালা চা এনে দেবো, বাবা?

অরিন্দম (কোমরের চামড়ার বেল্টটা খুলতে-খুলতে)। আগে স্নান ক'রে নিই। ট্রেনে যা গরম!

মিনি। তাহ'লে তোমার কাপড়চোপড় বের ক'রে দিই গে?

অরিন্দম। আরে না—তুই ব্যস্ত হোসনে।

[অরিন্দম বসলেন, অর্থাৎ প্রায় ছ'আঙুল উপর থেকে নিজেকে একটা সোফার উপর ছেড়ে দিলেন, স্প্রিংগুলো একবার ক্যাঁ-কোঁ ক'রে উঠলো।]

অরিন্দম। আঃ! নিজের বাড়ির মতো আরাম আর কোথায়! (শার্টের পকেট থেকে লম্বা ছাঁচের সোনার সিগারেটকেস বের করে সিগারেট ধরালেন, দেশলাইয়ের কাঠিটা না-নিবিয়েই মেঝের উপর ফেললেন—মিনি তাড়াতাড়ি অ্যাশট্রে এগিয়ে দিলে।

অরিন্দম। মিনি তো ভারি কাজের মেয়ে হয়েছে, দেখছি।

বুলি (বাপের গা ঘেঁষে ব'সে)। এ তোমার ভারি অন্যায়, বাবা, কেবল মিনির সঙ্গেই তোমার কথা। জানি জানি, ওকেই তুমি বেশি ভালোবাসো।

অরিন্দম। নাঃ, মিনিকে আর ভালোবাসবো না। ও আজকাল আমাকে প্রণাম করে, কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, চুপ ক'রে লক্ষ্মী মেয়ের

মতো পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। আর ক'দিন পরে একটা টেকো বুড়োকে বাবা বলে ডাকবে কিনা, তাই এখন থেকেই আমাকে পর ক'রে দিচ্ছে—

বুলি (মাথা নেড়ে)। না গো না, সে-আশা নেই। এক্ষুনি মিনি আমাকে কী বলছিলো জানো, বাবা? বলছিলো যে—

মিনি (সরোষে বুলির দিকে তাকিয়ে)। বুলি, চুপ!

বুলি। না, বাবা, এটা তোমাকে শুনতেই হবে। বলছিলো—হঠাৎ তার বাবার পরিত্যক্ত বেল্টটা তুলে নিয়ে) এটা কী, বাবা?

অরিন্দম। এই রে! ওটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেছিস! রেখে দে শিগগির! ওটাতে গুলি ভরা আছে।

বুলি। ও, পিস্তল বুঝি? কী করো তুমি, বাবা, পিস্তল দিয়ে?

অরিন্দম। কিছুই করিনে, সঙ্গে থাকে। বনে-জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করতে হয়—হাতে এক-আধটা অস্ত্র থাকা মন্দ না।

বুলি (বাবার হাঁটুর দিকে একটু তাকিয়ে দেখে)। আচ্ছা বাবা, এই হাফ-প্যান্টগুলো পরো কেন? কী বিশ্রী দেখায়!

অরিন্দম। আমরা জংলি মানুষ—আমাদের আবার বিশ্রী আর সুশ্রী!

বুলি। না বাবা, এগুলি আর পরতে পারবে না। আমারই তাকিয়ে দেখতে লজ্জা করে।

মিনি (বুলির শেষ কথাটা শুনে তার কান পর্যন্ত লাল হ'য়ে উঠলো—লজ্জা কাটিয়ে উঠে, ধমক দিয়ে)। বুলি, ফের আবার এ-রকম কথা বলবি তো তোকে আর আস্ত রাখবো না।

বুলি (অভিমানের সুরে)। দেখলে তো বাবা, রাতদিন ও আমাকে ও-রকম বকে। আমি আর এখানে থাকবো না, বাবা—এরা কেউ আমাকে দেখতে পারে না—এবার আমাকে তোমার সঙ্গে নাগপুরে নিয়ে চলো।

অরিন্দম (একবার ছোটো মেয়ের, একবার বড়ো মেয়ের দিকে তাকিয়ে)। আহা—তাতে আর হয়েছে কী? দু'বোন থাকলে মাঝে-মাঝে একটু-আধটু ঝগড়াঝাঁটি হবেই। তা না হ'লে আমার তো বাপু ভালো লাগে না।

বুলি (ঠোঁট ফুলিয়ে)। তা তো লাগবেই না, তোমার এই আহ্লাদি মেয়ে যা করে তাই তোমার ভালো লাগে। ওকে নিয়েই থাকো তুমি—আমি চললুম। (উঠে দাঁড়ালো)

অরিন্দম (বুলির হাত ধ'রে)। আরে যাস কোথায়—শোন, শোন। (পকেট থেকে চাবি বের ক'রে) এই চাবিটা নে—আমার স্যুটকেসে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স আছে, সেটা নিয়ে আয় দেখি। ঠিক উপরেই আছে—বেশি ঘাঁটিসনে।

[এক্ষুনি যে-কাণ্ডটা হ'য়ে গেলো, তা সত্ত্বেও দু'বোনে চকিতে একবার দৃষ্টিবিনিময় হ'লো। এই বাক্সয় কী আছে, তা ওরা দু'জনেই জানে। নিমেষে অভিমান ভুলে গিয়ে বুলি দৌড়ে বেরিয়ে গেলো।]

[একটু চুপচাপ]

অরিন্দম। তোর মা কখন ফিরবেন তা কিছু ব'লে গেছেন?

মিনি। এই…সন্ধে…হবে…আটটা…সাড়ে-আটটাও হ'তে পারে।

অরিন্দম। একেবারে মহামায়া দি সেকেণ্ড! আর তুই, মিনি? তুইও খুদে মহামায়া বুঝি? সাজগোজটা সেইরকমই তো করেছিস।

মিনি (একটু চুপ ক'রে থেকে)। তুমি স্নান করতে যাবে না, বাবা?

অরিন্দম। খোকা কোথায়? (মিনি চুপ) বেরিয়েছে?—

মিনি (ক্ষীণস্বরে)। হ্যাঁ।

অরিন্দম (তাঁর মুখে একটা ছায়া পড়লো—মিনির চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে)। আমার কাছ থেকে কী লুকোচ্ছিস বল্ তো?

মিনি। না বাবা, কিছু না।

অরিন্দম। বুঝেছি। ওরও উৎসব—তবে ঠিক একাদশীর উৎসব নয়। তাঁর ঠোঁট থেকে শুরু ক'রে সমস্ত মুখে একটা তিক্ত হাসি ছড়িয়ে পড়লো) এ ক'মাসে বথামির ইশকুলে ডবল-প্রোমোশন পেয়েছে বুঝি ?

মিনি (চুপ)।

অরিন্দম। তোর বৌদিকে দেখছিনে ?

মিনি। ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন বোধ হয়—আসবেন এক্ষুনি, এই তো এসেছেন। (দরজার ধারে উজ্জ্বলা এসে দাঁড়ালো) এসো, বৌদি।

[উজ্জ্বলা মন্থর পায়ে এগিয়ে এলো। সুন্দরী, কিন্তু বিষাদ-প্রতিমা। হাতে শাঁখা, গায়ে অল্প গয়না। মাথার আধখানা কাপড়ে ঢাকা, সামনের দিকের চুলগুলো উশকোখুশকো, সিঁদুর লেপটে গিয়ে কপালে একটা লাল তীর আঁকা হ'য়ে গেছে, চোখ বড়োই ক্লান্ত, চোখের কালিতে বিনিদ্র রাত্রির ইঙ্গিত। পরনে একটা কুৎসিত লতা-পাড় গোলাপি শাড়ি, বোধ হয় এইমাত্র তাড়াতাড়িতে বদলে এসেছে।

এগিয়ে এসে সে শ্বশুরকে সাড়ম্বরে, প্রায় আধ মিনিট ধ'রে, প্রণাম করলে। তার চোখ-মুখের ভাব পাথরের মতো, তা থেকে প্রাণের সবটুকু আভা কে যেন একেবারে শুষে নিয়েছে। সে কথা বলে কম, কিছুই বলতে না-হ'লে বেঁচে যায়—এদিকে শ্বশুর-বাড়িতে পাছে তার কর্তব্যে কোনো ত্রুটি হয়, পাছে অজান্তে কারো কাছে কোনো অপরাধ ক'রে ফেলে, এই ভয়ের তাড়নায় মাঝে-মাঝে কৃত্রিম সজীবতা দিয়ে নিজেকে চেতিয়ে তোলবার চেষ্টা করে। সে-চেষ্টা করুণ প্রহসনে যখনই মিলিয়ে যায়, তার উদাসীন বিষণ্ণতা আরো ঘন হয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে।

পুত্রবধূর দিকে তাকিয়ে অরিন্দমের মুখে প্রায় কথা সরলো না, ফ্যাকাশে একটুখানি হাসির চেষ্টা ক'রে বললেন :]

অরিন্দম। কেমন আছো, উজ্জ্বলা ?

প্রথম দৃশ্য

উজ্জ্বলা (মুখে-চোখে যথাসম্ভব উৎসাহ আনবার চেষ্টা ক'রে)। ভালো আছি, বাবা।

অরিন্দম। আর তোমার ছেলে?

উজ্জ্বলা (একেবারে মিইয়ে গিয়ে)। আছে একরকম।

অরিন্দম। একরকম কেন? ভালো নেই? বেশ মোটাসোটা, গাবদাগোবদা, ফুটফুটে টুকটুকে হয়েছে তো?

উজ্জ্বলা (অপরাধীর মতো—ভীরুভাবে)। ওর শরীরটা—

মিনি (বৌদির সাহায্যকল্পে)। ওর অসুখ, বাবা।

অরিন্দম। অসুখ?

মিনি (তাড়াতাড়ি)। তেমন কিছু নয়, এই···

অরিন্দম। ও কিছু না, অমন একটু-আধটু অসুখ-বিসুখ ওদের হ'য়েই থাকে। কিন্তু, উজ্জ্বলা, তোমার এ কী চেহারা হয়েছে!

উজ্জ্বলা (ভালো না-থাকাটাও শ্বশুরবাড়িতে হয়তো অপরাধ ব'লে গণ্য—তাই রীতিমতো ভয়ে-ভয়ে)। আমি—আমি বেশ ভালোই আছি, বাবা।

অরিন্দম। তোমাকে দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। (ফুর্তির চেষ্টা ক'রে) মিনি, তোদের বৌদিকে তোরা ভালো ক'রে খেতে-টেতে দিস তো? না কি, উজ্জ্বলা, তুমিই লজ্জা ক'রে খাও? খাওয়া নিয়ে আর যার কাছেই লজ্জা করো আমার কাছে ও-সব চলবে না, তা তো জানো?···হাসছিস যে, মিনি?

মিনি। আমি অবাক হ'য়ে যাচ্ছি, বাবা, যে এখনো তোমার খিদে পায়নি।

অরিন্দম। খিদে কি আর না পেয়েছে, কিন্তু এতদিন পরে তোদের দেখে খিদেটা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছি। তাও তো নাতির মুখখানা এখনো দেখিইনি। দর্শনী কী এনেছি জানো, উজ্জ্বলা? মোহর,

খাঁটি সোনার মোহর। তাও একটা নয়, দুটো নয়, তিনটেও নয়, চারটে। (পুত্রবধূর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলেন, কিন্তু উজ্জ্বলার পাথরের মতো মুখে কোনো রেখা পড়লো না।) কিন্তু তোমার যেন বেশি উৎসাহ দেখছি না।

উজ্জ্বলা (বাধো-বাধো গলায়)। আমি—আমি—

অরিন্দম (হঠাৎ, চড়া ফুর্তির স্বরে)। তুমি কিছু ভেবো না, উজ্জ্বলা, খোকাকে এবার আমি ঠিক ক'রে দিয়ে যাবো। তা তোমাকেও বলি, তুমিও বোধ হয় মুখ বুজে বড্ড বেশি সহ্য করো। এত রূপ তোমার—তুমি পারো না ঐ হতভাগাকে তোমার পায়ের উপর এনে লোটাতে ?

[উজ্জ্বলা মাথা নিচু ক'রে চুপ। মিনির উশখুশ ভাব। এই আকস্মিক গুমোট ভেঙে দিয়ে বুলি ঢুকলো ঘরে। যেমন কিনা চৈত্রের বিকেলে দক্ষিণের বন্ধ জানলা হঠাৎ খুললে দমকা হাওয়ায় চমক লাগায়। তার কাঁধে, তার দু'হাতে, তার মাথায় রং-বেরংএর শাড়ি, খুশি উপচে পড়ছে তার কণ্ঠে ছোটো-ছোটো অদ্ভুত চীৎকারে। দৌড়ে সে এলো বাবার কাছে, শাড়িগুলো ঝুপ ক'রে মেঝের উপর ফেলে বললে :]

বুলি। বলো, কোনটা কার।

অরিন্দম। যার যেটা পছন্দ।

বুলি। আমার পছন্দ যে সব ক'টাই।

অরিন্দম। উহুঁ, সে হবে না।

বুলি। যাওঃ—আমি একটাও চাইনে।

অরিন্দম। বুলি, তুই এতক্ষণ কী করলি রে ? আমার সব জিনিশ ঘাঁটলি বুঝি ব'সে-ব'সে ?

বুলি। ঘাঁটলে কী হয় ?

অরিন্দম। আবার গুছোতে হয়।

বুলি (মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে)। ব'য়ে গেছে আমার গুছোতে !

প্রথম দৃশ্য

অরিন্দম। কী বিচ্ছিরি অগোছালো তুই, বুলি, শাড়িগুলো সব মেঝেয় না-ছড়ালেই কি চলতো না?

[মিনি নিচু হ'য়ে শাড়িগুলো গুছিয়ে রাখতে আরম্ভ করলো, একটু পরে উজ্জ্বলাও এলো তাকে সাহায্য করতে।]

মিনি। থাক বৌদি, আমিই রাখছি ঠিক ক'রে।

[উজ্জ্বলা কোনো কথা বললে না, কাজেও বিরত হলো না। তার মুখে, তার হাতের ভঙ্গিতে প্রকাশ পেলো শুধু একটা বিশুদ্ধ কর্তব্যবোধ।]

অরিন্দম। কিন্তু আর দেরি না, উজ্জ্বলা, আমাদের মনোহরণকে দর্শন না-ক'রে আর এক মুহূর্তও না। চলো।

[অরিন্দম উঠে দাঁড়ালেন। উজ্জ্বলা শাড়ি গোছাবার কাজ মিনির হাতেই সমর্পণ ক'রে শ্বশুরের অনুসরণ করলে।]

বুলি (বাবার সঙ্গে যেতে-যেতে)। কই, কোনটা কার তা তো বললে না, বাবা।

অরিন্দম। বললুম যে, যার যেটা পছন্দ।

বুলি। না বাবা, তা হবে না—

অরিন্দম। এখন এ-কথা থাক, তোর মা এসে যাকে যেটা দেবার দেবেন।

বুলি। ওঃ, সেই আশায় থাকো তুমি! তুমি কি ভেবেছো মা এ-সব শাড়ি ছুঁয়েও দেখবেন?

অরিন্দম (অবাক হ'য়ে)। কেন, ছুঁয়ে না-দেখবার কী হয়েছে?

বুলি। জানো না বুঝি, মা যে আজকাল সন্নেসিনি হয়েছেন!

অরিন্দম। সন্নেসিনি!

[হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন অরিন্দম; মিনির কানে সে-হাস রীতিমতো অশ্লীল শোনালো।

অরিন্দম, বুলি, উজ্জ্বলা বেরিয়ে গেলো। মিনি একলা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শাড়িগুলোকে ভাঁজ ক'রে একটার পর একটা সাজালো।

তারপর সবগুলি হাতে ক'রে ভিতরে যাবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় বারান্দায় অরুণকে দেখা গেলো। তার গায়ে হাত-কাটা রঙিন সিল্কের শার্ট, পায়ে স্যাণ্ডেল। খুবই ছেলেমানুষ, বয়স পঁচিশও হয়নি। চেহারাখানা ভালোই, কিন্তু অত্যাচারের ছাপ চোখে-মুখে এখনই পড়েছে। তার স্ফীত, স্থূল ভাবটা যেন শুধু দেহের নয়, মনেরও।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে অরুণ পা টিপে-টিপে ঘরে ঢুকলো। চাপা গলায় ডাকলো :]

অরুণ। মিনি!

মিনি (চমকে পিছন ফিরে তাকিয়ে)। দাদা!

অরুণ (খুব তাড়াতাড়ি)। পপ্ এসেছে?

মিনি। হ্যাঁ, আজ আর তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ো না, দাদা। (হাতের শাড়িগুলি সেণ্টার-টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলো।)

অরুণ। আমার গতিবিধি সম্বন্ধে তোর কোনো পরামর্শের প্রয়োজন নেই। শোন, আমাকে দশটা টাকা দিতে পারিস?

মিনি। দশ টাকা আমি কোথায় পাবো?

অরুণ। ন্যাকামি করিসনে, তোর হাতেই তো আজকাল সংসার খরচের সব টাকা।

মিনি। সেদিনও তো তোমাকে কুড়ি টাকা দিলুম—

অরুণ। সেইজন্যই তো আজ আবার দশ টাকা দিতে বলছি।

মিনি। টাকা আমি তোমাকে দিতে পারি যদি আজ তুমি বাড়ি থেকে আর না বেরোও

অরুণ। যদি না-ই বেরুবো, তবে আর টাকা দিয়েই বা কী হবে?

মিনি। তা'হলে হ'লো না।

অরুণ। ডেঁপোমি রাখ, আমাকে এক্ষুনি আবার বেরোতে হবে।

প্রথম দৃশ্য

মিনি। দাদা, তুমি কি একটা দিনও বাড়ি থাকতে পারো না? কখনো কি তোমার মনে হয় না—

অরুণ। (কানে আঙুল দিয়ে)। আর না! আর না! উপদেশ শুনতে-শুনতে প্রাণটা বেরিয়ে গেলো। সাধে কি আর বাড়ি থাকতে ইচ্ছে করে না!

মিনি। কই, বাড়িতে তো কেউ তোমাকে কিছু বলে না। কোনদিনই বলেনি। ছেলেবেলা থেকে তুমি যা ইচ্ছে তাই করেছো। বাবা তোমাকে এত বেশি প্রশ্রয় দিয়েছেন—

অরুণ। তোদেরও দিয়েছেন, মিনি, তোদেরও দিয়েছেন—নয়তো একটা ঢংওয়ালি মেয়েমানুষের পায়ে রাশি-রাশি টাকা তোরা কি ঢালতে পারতিস!

মিনি। মুখ সামলে কথা বোলো, দাদা!

অরুণ। ওঃ, ওর অর্ধেক টাকাও যদি আমি পেতুম, কত বড়ো একটা বিজনেস ফাঁদতে পারতুম। তাহ'লে কি আর দশটা টাকার জন্য তোর কাছে অপমানিত হ'তে হ'তো!

মিনি। তোমাকে যা বলা উচিত তার কিছুই বলিনি!

অরুণ। চেপে যাসনে, মিনি, প্রাণ যা চায় ব'লে নে। বেশিদিন তো আর বলতে পারবিনে। ক্যাপিট্যালিস্ট পেয়ে গিয়েছি—সব ঠিকঠাক—ব্যবসাটা একবার ফেঁপে উঠলে আর ভাবনা কী! মিলিঅনে-আর হলুম ব'লে। এ-বাড়ি থেকে যত টাকা নিয়েছি, সব ফিরিয়ে দেবো—সুদসুদ্ধু। টাকা রোজগার করতে পারছি না ব'লেই তো আজ আমি অপদার্থ অমানুষ—আসুক একবার টাকা হাতে, তখন এই আমাকেই—(হঠাৎ থেমে গিয়ে গলার স্বর নামিয়ে) দে না, মিনি, দশটা টাকা। দশটা না পারিস পাঁচটাই দে।

মিনি। আজ তোমাকে এক টাকাও দিতে পারবো না।

অরুণ। দিবি না, বল্।

মিনি। বেশ—দেবো না।

অরুণ। তা'হলে আর সময় নষ্ট করবো না, চলি। (যাবার ভঙ্গি ক'রে—হঠাৎ একটু থেমে) এই শাড়িগুলো বুঝি পপ্-এর উপহার? (উপরের শাড়িটা একটু খুঁটে দেখে) বাঃ, বেশ, বেশ। পপ্-এর পছন্দ আছে।

মিনি (শাড়িগুলোর উপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে)। সরো, এগুলোতে হাত দিয়ো না।

অরুণ। আমি ছুঁয়ে দেখলেও দোষ! বা—বাঃ! (স'রে গিয়ে) না-হয় একটা শাড়ি আমাকে দিয়েই দিলি—অনেকগুলো তো আছে।

মিনি (শাড়িগুলো হাতে তুলে নিয়ে)। শাড়ি দিয়ে তুমি কী করবে?

অরুণ। কেন, শাড়ি কি সংসারে কোনো কাজেই লাগে না? কোনো গরিব মেয়েকে দান ক'রে পরোপকার করা যায়, কোনো দোকানে নিয়ে গেলে মরুভূমিতে দু' ফোঁটা বারিবর্ষণ হ'তে পারে—

মিনি। দাদা, তুমি এত নির্লজ্জ! (শাড়িগুলো নিয়ে হনহন ক'রে বেরিয়ে গেলো।)

অরুণ (মিনির পিছনে চীৎকার ক'রে)। মনে রাখিস মিনি, একদিন আমি এর প্রতিশোধ নেবো!

[হঠাৎ অরিন্দমের প্রবেশ। পিঙ্ক রঙের ডোরা-কাটা পা-জামা পরনে, গায়ে হলদে রঙের ড্রেসিং গাউন। স্নাত, পরিতৃপ্ত চেহারা, কিন্তু মুখে কেমন একটা উদ্বেগের ছায়া কিছুতেই গোপন থাকছে না।]

অরিন্দম। কিসের প্রতিশোধ?

[অরুণ ধরা-পড়া চোরের মতো থতমত খেয়ে থমকে দাঁড়ালো।]

অরিন্দম। জিগেস করি, বোনের উপর তম্বি করা হচ্ছিলো কী নিয়ে।

[অরুণ কোনো জবাব না দিয়ে আস্তে-আস্তে বাইরের দরজার দিকে যেতে লাগলো।]

অরিন্দম (গলা চড়িয়ে)। খোকা!

[অরুণ থমকে দাঁড়ালো।]

অরিন্দম। শোন।

[অরুণ দু'পা এগুলো]

অরিন্দম (ছেলের দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে)। বড্ড মোটা হ'য়ে যাচ্ছিস।

অরুণ (চুপ)।

অরিন্দম। দিনে খুব ঘুমোস বুঝি ?

অরুণ। কই, না।

অরিন্দম। এবারে না-হয় এম.-এ. ক্লাশেই ভর্তি হ'য়ে যা।

অরুণ। কী হবে প'ড়ে ?

অরিন্দম। সময় তো কাটবে।

অরুণ। শুধু এইজন্যেই ?

অরিন্দম। সময়টা ভালোভাবে কাটানোই তো মস্ত লাভ।

অরুণ। (চুপ)।

অরিন্দম। তাহ'লে একটা কাজকর্মই কিছু কর্।

অরুণ। কাজ কোথায় ?

অরিন্দম। আমি খুঁজে দিচ্ছি।

অরুণ। বেশ।

[ব'লেই অরুণ চ'লে যাবার ভঙ্গি করলে, অরিন্দম তাড়াতাড়ি আর-একটা কথা পাড়লেন।]

অরিন্দম। তোর ছেলের তো অসুখ।

অরুণ। তাই নাকি ?

অরিন্দম। অনেকদিন ধ'রেই নাকি এ-রকম চলছে। তোরা যে কেউ কিছু খেয়াল করিসনি তাতে অবাক হচ্ছি।

অরুণ (একটু চুপ ক'রে থেকে)। আমি কী করবো—তোমরা বিয়ে দিয়েছো, তোমরাই দেখবে।

অরিন্দম। ও, তুই তাই ভাবছিস ?

অরুণ। তা না হ'লে আর এত অল্প বয়সে আমার বিয়ে দিয়েছো কেন তোমরা ?

অরিন্দম (চেষ্টা ক'রে রাগ চেপে—মৃদুস্বরে)। অল্প বয়সে বিয়ে করা তো ভালোই। আজকাল বেশির ভাগ ছেলে টাকার টানাটানিতে সেটা পারে না—তোর তো আর সে-ভাবনা নেই।

অরুণ। আমার টাকা কোথায় ?

অরিন্দম (চড়া গলায়)। ওঃ, এ-বিষয়ে তো খুব টনটনে জ্ঞান দেখছি !

অরুণ (শরীরের ভার এক পা থেকে অন্য পায়ে সরিয়ে)। আমি এখন যাই।

অরিন্দম। কোথায় যাচ্ছিস ?

অরুণ। বেরুচ্ছি একটু।

অরিন্দম। এই তো বাড়ি ফিরলি—এক্ষুনি আবার বেরোতে হবে ? কোথায় থাকিস, করিস কী ?

অরুণ (কোনো জবাব না দিয়ে পা বাড়ালো)।

অরিন্দম (চেঁচিয়ে)। এই ! (অরুণ থমকে দাঁড়িয়ে গেলো) এখন আবার বেরুচ্ছিস কেন ?

অরুণ। এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ আছে।

অরিন্দম। তুই নাকি মোটে বাড়িতেই থাকিস না ?

অরুণ। এখানে-ওখানে যাই। কাজকর্মের চেষ্টা করি।

অরিন্দম। রাত্তিরে ?

অরুণ (অত্যন্ত সরলভাবে)। রাত্তিরে তো বাড়িতেই থাকি। এক-আধদিন ফিরতে দেরি হয়—সিনেমায় যাই-টাই।

অরিন্দম (ছেলের চোখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার চেষ্টা ক'রে তোমার প্রত্যেকটি কথা মিথ্যে। তোমার ইতরামো অনেক সহ্য করেছি—এবার আমি তোমাকে সজুত ক'রে ছাড়বো।

[অরুণ লাল হ'য়ে উঠলো, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে জুতো দিয়ে মেঝেটা আস্তে-আস্তে ঠুকতে লাগলো।)

অরিন্দম। কী, আমার কথা কানে যাচ্ছে না ?

অরুণ। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি যাই।

অরিন্দম (জ্ব'লে উঠে) হবে না তোমার যাওয়া। আমি বলছি, তুমি এখন বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে না।

অরুণ (তার মুখ পাথরের মতো)। আমাকে যেতেই হবে।

অরিন্দম। কক্খনো না! এখন যদি তুমি বেরোও, এ-বাড়িতে আর তুমি ফিরতে পারবে না, এই আমি ব'লে দিলাম! (রাগে রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেলেন।)

[অরুণ মুখ-চোখ লাল ক'রে একটু দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ যেন মন স্থির ক'রে হনহন ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক দরজার কাছে নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা। নিরঞ্জন অরুণেরই বয়সি, ছিপছিপে লম্বা, সুস্থ সবল হাসিখুশি।

নিরঞ্জন। এই যে, অরুণ।

অরুণ (ভিতরের উত্তেজনা সামলে নিয়ে যথাসাধ্য স্বাভাবিক স্বরে)। এ কী! নিরঞ্জন!

নিরঞ্জন। এই তো এলুম।

অরুণ। তারপর ? কী খবর ? তুমি না লাহোরে ছিলে ?

নিরঞ্জন। সেখান থেকে এক ধাক্কায় বর্মা। মাঝে কিছুদিন কলকাতায় বিশ্রাম।

প্রথম দৃশ্য

অরুণ। ও, তুমি বর্মা যাচ্ছো! তার মানে, বেশ বড়োরকমের একটা লিফ্‌ট্‌! কন্‌গ্র্যাচুলেশন্স।

[বোধ হয় নিজের আর্থিক সচ্ছলতা দেখাবার জন্যেই নিরঞ্জন পকেট থেকে দামি সিগারেটের টিন বের ক'রে বন্ধুর সামনে ধরলো। তারপর দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি অরুণের মুখের দিকে এগিয়ে বললে।]

নিরঞ্জন। তোমরা সব কেমন আছো ?

অরুণ। ঠিক জানি না—বোধ হয় ভালোই। (দাঁত বের ক'রে হাসলো) বোসো তুমি—মিনিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নিরঞ্জন। তুমি—তুমি বেরুচ্ছো নাকি ?

অরুণ। হ্যাঁ ভাই, আমাকে একটু বেরোতেই হচ্ছে—কিছু মনে কোরো না। আছো তো কিছুদিন কলকাতায় ?

নিরঞ্জন। টেনে-টুনে মাসখানেক।

অরুণ। আচ্ছা, আজ আমার একটু তাড়া আছে, আবার দেখা হবে। (ভিতরের দরজার দিকে দু'পা এগিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। তারপর ব্যস্তভাবে ফিরে এসে) বাই দি ওয়ে, নিরঞ্জন, তোমার কাছে টাকা আছে ?

নিরঞ্জন (একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে, কিন্তু মুখে সে-ভাব ফুটতে না দিয়ে) এখন ? আমার সঙ্গে ? (অরুণ মাথা নাড়লো) কত টাকা ?

অরুণ। দু'শো ?

নিরঞ্জন। অত তো হবে না।

অরুণ (ভুরু কুঁচকে)। শো খানেক ?

নিরঞ্জন (একটু ভেবে)। তা হ'তে পারে।

অরুণ। একশোটা টাকা এখন আমাকে দিতে তোমার কি খুব অসুবিধে হবে ?

নিরঞ্জন। না, অসুবিধে কিসের। তবে কিনা—টাকাটা ঠিক আমার নয়, আমার আপিশের।

অরুণ। আহা তার জন্যে ভাবছো কেন? কবে ফেরৎ চাও বলো! কাল?

নিরঞ্জন। কী আশ্চর্য! এত তাড়া কিসের। (পকেট থেকে বৃহৎ মনিব্যাগ বের ক'রে টাকা দিলে।)

অরুণ। (দ্রুতবেগে টাকাটা পকেটে ভ'রে)। ভাগ্যিশ তোমার সঙ্গে দেখাটা হ'লো। মুশকিল কী হয়েছে, জানো, একটা লোকের আজ আমাকে পাঁচশো টাকা পেমেণ্ট ক'রে যাবার কথা—সে এলোই না। ছুটছি এখন তার ওখানে। আর বলো কেন ভাই, বিজনেস-এর যা ঝকমারি!

নিরঞ্জন। তাহ'লে ব্যবসাই ধরলে?

অরুণ। কী আর করি, বলো—তোমার মতো তুখোড় ছেলে তো আর নই যে ফশ ক'রে একটা চাকরি বাগিয়ে ফেলবো। এ-সব বিষয়ে কথা আছে তোমার সঙ্গে—পরে হবে। চলি এখন, মিনিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। (ভিতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো।)

[কোণের টেবিল থেকে একটা মাসিকপত্র তুলে নিয়ে নিরঞ্জন বসলো। একটু পরে মিনি এলো ঘরে। তার মুখের ভাব অত্যন্ত কঠোর।]

নিরঞ্জন (সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে, নমস্কার ক'রে)। কেমন আছেন?

মিনি (অস্পষ্ট একটু প্রতি নমস্কার করলে, কিছু বললে না)।

নিরঞ্জন। ভালো আছেন?

মিনি (কিছু বলতে হবে ব'লেই)। আপনি ভালো?

নিরঞ্জন। ভালো আর ছিলুম কোথায়—তবে এখন বেশ ভালো বোধ হচ্ছে বটে।

মিনি (সচকিত হ'য়ে)। তার মানে ?

নিরঞ্জন। লাহোরে প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিলো—কলকাতায় ফিরে বেঁচেছি। যে যাই বলুক, কলকাতার মতো জায়গা নেই।

মিনি (বক্রভাবে)। আমরা তো শুনেছি লাহোর বেশ ভালো জায়গা।

নিরঞ্জন। আরে ছি ছি, লাহোরের নাম আমার কাছে আর করবেন না।—আমার চিঠি পেয়েছিলেন ?

মিনি। চিঠি লেখবার কোনো দরকার ছিলো না।

নিরঞ্জন। চিঠির প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই নিজেই এসে হাজির হয়েছি—না ?

মিনি (একটু চেষ্টা ক'রে)। যদি মনে ক'রে থাকেন আপনার আসবার জন্য আমি খুব ব্যস্ত হ'য়ে ছিলুম, তাহ'লে ভুল করেছেন।

নিরঞ্জন (মিনির মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে)। আপনি আমার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকবেন আমার কি এতই ভাগ্য! বোকার মতো নিজের ইচ্ছেটা অন্যের উপর চাপাই, আর—

মিনি। আপনি কী বলছেন, নিরঞ্জনবাবু!

নিরঞ্জন। আনন্দের ঝোঁকে দু'একটা অসংগত কথাও হয়তো মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে—ক্ষমা করবেন। এতদিন পর কলকাতায় এসে কী ভালোই লাগছে। (ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি ক'রে, যেন তারই বাড়ি, এবং মহিলাটিই অতিথি, এইভাবে) আপনি বসুন না।

মিনি (হঠাৎ কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে)। আপনি বসুন।

নিরঞ্জন। আপনি না বসলে কেমন ক'রে বসি ?

মিনি। কেন ?

নিরঞ্জন। বাঃ, একজন ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে থাকবেন, আর আমি বসবো!

মিনি। ভদ্রমহিলার সামনে সিগারেট খেতে বুঝি বাধা নেই ?

নিরঞ্জন। তা তো আগেও খেতুম—ভুলে গেছেন ?

মিনি। আপনার স্মরণশক্তি যতটা প্রখর, আমার ততটা নয়।

নিরঞ্জন। তা-ই দেখছি। (ফুরিয়ে আসা সিগারেটটি ছাইদানে ফেলে দিয়ে) আপনি আজ একটু ব্যস্ত আছেন বোধ হচ্ছে।

মিনি। হ্যাঁ, বাবা আজই এলেন নাগপুর থেকে।

নিরঞ্জন। ও, তাই নাকি ? খুব আনন্দে আছেন তা'হলে ?

মিনি। খুব ব্যস্তও আছি।

নিরঞ্জন। বুঝেছি।... আচ্ছা—(যাবার ভঙ্গি করলে)

মিনি। (নিতান্ত চক্ষুলজ্জার তাড়নায়। আর-একটু বসবেন না ?

নিরঞ্জন। বসবো ব'লেই তো এসেছিলুম, কিন্তু...আপনার ব্যবহারে বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছিনে, সত্যি বলতে। (মিনির মুখে গভীর একটি লাল রং ছড়িয়ে পড়লো। হাতের নখের সঙ্গে নখ ঘষতে-ঘষতে সে কী যেন বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তার আগেই নিরঞ্জন আবার বললে) অবশ্য উৎসাহের অপেক্ষাও আমি বিশেষ রাখিনে, তা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। আমি একটু বেহায়া ধরনেরই মানুষ।... আপনার অনেক সময় নষ্ট করলুম, এখন চলি।

[ঠিক এই সময়ে বুলির গলার তীক্ষ্ণ ডাক শোনা গেলো, 'মিনি মিনি!' আর পর মুহূর্তেই হাওয়ার ঝাপটার মতো বুলি সে-ঘরে এসে ঢুকলো। ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো নিরঞ্জনকে দেখে।]

নিরঞ্জন (যেতে-যেতে একটু দাঁড়িয়ে)। কী, আমাকে চিনতে পারছো ?

বুলি। বাঃ, আপনি নিরঞ্জনবাবু না ? কখন এলেন ? চ'লে যাচ্ছেন নাকি ?

নিরঞ্জন। তুমি দেখছি মস্ত বড়ো হ'য়ে গেছো। রীতিমতো ভদ্রমহিলা !

মিনি। বুলি, তোর পণ্ডিতমশাইকে না আসতে দেখলুম? এর মধ্যে পড়া হ'য়ে গেলো?

বুলি। আজ তো আমি পড়বো না।

মিনি। কেন, পড়বি না কেন?

বুলি। রোজ-রোজ পড়া কি ভালো? মাঝে-মাঝে ছুটি না-নিলে বুদ্ধিতে মরচে পড়ে যায়।

নিরঞ্জন। ঠিক কথা! বুদ্ধি যাদের অল্প তারাই পড়াশুনো করে বেশি।

মিনি। নিরঞ্জনবাবু, বুলির মতিগতি এমনিতেই সুবিধের নয় তার উপর ওর মাথাটি দয়া ক'রে আর চিবোবেন না।

বুলি। সে-কাজটি আমি নিজেই প্রায় সুসম্পন্ন ক'রে এনেছি, কারো সাহায্যের দরকার হবে না। (নিরঞ্জনকে) আপনি বসুন না, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

নিরঞ্জন। আর-একদিন এসে বসবো।

বুলি। সে কী! এখনই যাচ্ছেন?

নিরঞ্জন। যাবো না?

বুলি। বাঃ, আমি এলাম, আর অমনি চললেন! এতক্ষণ আমাকে ফেলে অনেক সব মজার-মজার গল্প করলেন তো আপনারা?

মিনি (ধমক দিয়ে)। চুপ কর্।

বুলি। উঃ, কেন যে ছোটো হ'য়ে জন্মেছিলাম! আর তাও তো তুই মোটে চার বছরের বড়ো! বিয়ে হ'য়ে গেলে তুই আর আমি সমান-সমান হয়ে যাবো, জানিস?

মিনি। নিরঞ্জনবাবু, আপনি নিশ্চয়ই বুলির অসভ্যতা দেখে স্তম্ভিত? ও দিন-দিন জংলি হয়ে যাচ্ছে, কিসে যে শোধরাবে বুঝি না।

নিরঞ্জন। শোধরাবার ভার আপনি বুঝি নিয়েছেন?

মিনি। ফল যে বিশেষ হয়নি তা দেখতে পাচ্ছেন তো ?

নিরঞ্জন (ঈষৎ হেসে)। একেবারে হয়নি তা কেমন ক'রে বলি ? নিজেকে শোধরানোও তো কম কথা নয়।…আচ্ছা—(বাইরের দরজার দিকে এগোলো।)

বুলি। কাল আবার আসবেন।

নিরঞ্জন। কালই ? আসবো আর-একদিন। (অনাবশ্যকভাবে আরো একবার বিদায় নিয়ে) চলি তাহ'লে। (মিনির মুখের দিকে একবার তাকালো, কিন্তু মিনি চোখ সরিয়ে নিলে।)

[নিরঞ্জন চ'লে গেলো। বুলি বিরস ম্লান মুখে কোণের টেবিলের ধারে গিয়ে ইণ্ডিয়ান লিসনারের পাতা ওল্টাতে লাগলো—রেডিওতে শোনবার মতো কোথাও কিছু আছে কিনা দেখা যাক।

মিনি যেখানে ছিলো চুপ ক'রে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো, একটু পরে বুলিকে ডাক দিয়ে বললে :]

মিনি। বুলি, একটা কথা শোন।

বুলি (চোখ না-তুলে)। বলতে হবে না, বুঝেছি।

মিনি। তুই এখন যথেষ্ট বড়ো হয়েছিস—

বুলি (চোখ তুলে)। হয়েছে, হয়েছে—থাম। তুই যা বলবি স—ব বুঝে নিয়েছি। তার জবাবও তৈরি আছে মনে-মনে। শোন—

কী হবে বলো আমার দোষ অসংখ্য গণিয়া,
জানো তো আমি নিতান্তই অসংশোধনীয়া।

মিনি। সং !

বুলি (এক পাক ঘুরে)। আমি সং—কত রং—কত ঢং—চিঁড়েতন রুহিতন—হরতন—আরো শুনবি ?

মিনি। শোন বুলি, সত্যি তোকে এখন আর এ-সব মানায় না। লোকে নিন্দে করবে।

বুলি (কড়ে আঙুলের নখ কামড়ে—চিন্তিতমুখে)। করবে নাকি ?

মিনি। আচ্ছা, ঐ ভদ্রলোকের সামনে ও-রকম চপলতা করাটা কি তোর ভালো হয়েছে ? ভদ্রলোক কী ভাবলেন বল তো ?

বুলি। কে, নিরঞ্জনবাবু ? আমাকে একটা জংলি ভেবে গেলেন—না ?

মিনি (উৎসাহিত হ'য়ে)। সকলেই তোকে তা-ই ভাবে, বুলি। সভ্য হ'য়ে চলতে না শিখলে তোর উপায় হবে কী ?

বুলি (উদ্বিগ্ন মুখে, দ্রুতবেগে নখ কামড়াতে-কামড়াতে)। আচ্ছা মিনি, ঠিক ক'রে বল তো কোন কথাটা আমার জংলির মতো হয়েছে ? সেই বিয়ের কথাটা—না ?

মিনি। তবে তো বুঝিসই। তাছাড়া ঐ ভদ্রলোককে তুই আবার আ-সতেই বা বললি কেন ?

বুলি। বা রে, এতে আবার কী দোষ হ'লো ? আগে তো উনি প্রায়ই আসতেন, তুমিই তো ওঁকে কত আসতে বলেছো—বলোনি ?

মিনি (একটু চুপ ক'রে থেকে)। কী যেন, ভুলে গেছি।

বুলি। নিরঞ্জনবাবুকে আমার বেশ লাগে।

মিনি। তুই জানিসনে, বুলি, ও লোক মোটেও ভালো নয়।

বুলি (ভুরু কুঁচকে)। লোক ভালো নয় ?

মিনি। ওঃ, ওর লাহোরের কীর্তিকাহিনী যদি শুনিস—

বুলি (কৌতূহলী হ'য়ে)। কী রে ? কী রে ?

মিনি। না—না—সে তোকে বলা যায় না। সে অতি ভয়ানক।

বুলি। (নখ কামড়াতে-কামড়াতে একটু চিন্তা ক'রে)। ভয়ানক না ছাই—ও-সব বাজে কথা শুনেছিস। নিরঞ্জনবাবু বেশ লোক—চমৎকার লোক।

মিনি। তোর কাছে এখন জগতের সব লোকই বেশ।

বুলি। তুই ছাড়া। (ব'লেই মিনির চুলে ছোট্ট একটা টান দিয়ে দৌড়ে পালালো।)

একা ঘরে মিনিকে দেখালো যেন বড়ো ক্লান্ত, বড়ো অসহায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে' সে একটা চেয়ারে ব'সে পড়লো। হাত দুটি বুকের উপর জোড় ক'রে চোখ বুজে অস্ফুটস্বরে বললে—'মা!' তারপর জোড়-করা হাতের উপর কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। যেন ভিতর থেকে ধাক্কা খেয়ে একবার কেঁপে উঠলো তার শরীর।

মুখ তুলে চোখ মেলে'ই মিনি দেখতে পেলো তার সামনে উজ্জ্বলা দাঁড়িয়ে। এ কী চেহারা তার! শাড়িটা বিস্রস্ত, চুল অসম্বৃত, গালে কান্নার কালো দাগ। আঁচলের খুঁটটা আঙুলে একবার জড়াচ্ছে, একবার খুলছে।]

মিনি (চমকে)। বৌদি, কী হয়েছে?

উজ্জ্বলা (ভাঙা-ভাঙা গলায়)। গেছে, নিয়ে গেছে।

মিনি। কী? কী নিয়ে গেছে?

উজ্জ্বলা (আঁচলের খুঁটটা তুলে ধ'রে চরম হতাশার ভঙ্গিতে হাত ওল্টালো)।

মিনি (ব্যাপারটা হঠাৎ বুঝতে পেরে)। ও, সেই মোহর।

উজ্জ্বলা (ভাঙা-ভাঙা গলায়)। আঁচলে বেঁধে রেখেছিলাম— ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—নিয়ে গেছে। চারটেই।

মিনি। বৌদি, এর জন্যে এত কাঁদছো তুমি! কী আর হয়েছে— দাদা না-হয় ঐ মোহর ক'টা খরচই করলে—বাবা তো জানবেন না, তাহ'লেই হ'লো।

উজ্জ্বলা (ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে—বিকৃতস্বরে)। মিনি, মিনি, আমি কেন মরি না—মরলেই তো বাঁচি।

মিনি। ছি বৌদি, ও-কথা বলতে নেই। চলো, ঘরে চলো।

উজ্জ্বলা (অসহায়ভাবে কাঁদতে-কাঁদতে)। না, না—

মিনি (কঠোরস্বরে)। কী ছেলেমানষি করছো, বৌদি !

উজ্জ্বলা (কান্না গিলে ফেলে—মুখ তুলে)। মিনি !

মিনি (বৌদির হাত ধ'রে)। একটু হাসিখুশি হ'তে শেখো, বৌদি।

উজ্জ্বলা। মিনি, আমি হাসতে ভুলে গেছি।

মিনি। হয়তো সেইজন্যই দাদা আরো দূরে স'রে যাচ্ছে। বৌদি, হাসি দিয়ে যাকে ভোলাতে পারলে না. কান্না দিয়ে কি তাকে গলাতে পারবে।

উজ্জ্বলা (কপালে হাত রেখে)। কিছুই পারলুম না—আমার মধ্যে কিছু নেই—আমি একেবারে বাজে।

মিনি (স্নিগ্ধস্বরে)। ভেবো না, বৌদি। মা-মহামায়া তোমাকে শান্তি দেবেন।

উজ্জ্বলা (উদ্দেশে প্রণাম ক'রে)। মা ! (কথাটা বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনালো।)

যবনিকা

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কয়েকদিন পরে অরিন্দমের ড্রয়িংরুমে সন্ধেবেলা। নীরদ ডাক্তার আর অরিন্দম কথা বলছেন। নীরদ ডাক্তার অরিন্দমেরই সমবয়সি ও বাল্যবন্ধু।]

অরিন্দম। কী-রকম মনে হচ্ছে ?

নীরদ। দেখি।

অরিন্দম। তোমার মুখের চেহারা দেখে বিশেষ ভরসা পাচ্ছিনে, নীরদ।

নীরদ। চেষ্টার তো ত্রুটি হচ্ছে না—তারপর দেখা যাক।

অরিন্দম। সত্যি ক'রে বলো, ওকে বাঁচাবার কোনো কি উপায় নেই !

নীরদ (অরিন্দমের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে)। বেঁচে ওঠাই যে সব সময় সবচেয়ে ভালো এমন মোহ মনে স্থান দিয়ো না, অরিন্দম। বিকলাঙ্গ হ'য়ে বেঁচে থাকার চাইতে—

অরিন্দম। না—না—না। ওকে সম্পূর্ণ সুস্থ ক'রে তোলো—তার জন্যে যা লাগে—যত খরচ হয়—

নীরদ। তোমাকে তো বলেছি এ এমন দুরন্ত বিষ যে এর বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই প্রায় করবার নেই। পর-পর সাতটি সন্তানকে খরচের খাতায় লিখে রাখতে পারো। . . . একটু শক্ত হও, অরিন্দম।

অরিন্দম (কপালে হাত বুলিয়ে)। আমি তো শক্তই আছি।

নীরদ। তোমার ছেলেকে দেখছি না যে ?

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরিন্দম। ছেলে? আমার ছেলে? আমি তো তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

নীরদ। তাড়িয়ে দিয়েছো? তা রাগ ক'রে ক'দিন আর থাকতে পারবে! ও-সব ছেড়ে দাও, তাকে ফিরিয়ে আনো—ভালো ক'রে তার চিকিৎসা করি। নাতির জন্যে অস্থির হ'য়ে পড়েছো—ছেলের চিকিৎসা না-হ'লে তার কী দশা হবে ভেবে দেখেছো কি? ও-কালসাপ কখনো পুষে রাখতে আছে! হঠাৎ একদিন ফণা তুলে একেবারে মাথায় ছোবোল মারবে। মারবেই। ব্যস— নরকের রাস্তা সাফ।

অরিন্দম। ঐ একটি রাস্তাই তো ওর পছন্দ।

নীরদ। ও তো রাগের কথা হ'লো, কাজের কথা হ'লো না। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে শিগগিরই একদিন আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো, খামকা দেরি কোরো না। ভেবো না—সে নিজেই ফিরে এলো ব'লে।

অরিন্দম। ঠিক ধরেছো! সুখের অভাব হলেই ও লেজ গুটিয়ে বাড়ি ফিরবে, ও এত বড়োই অমানুষ।

নীরদ। তুমি আজ বড্ড উত্তেজিত আছো, অরিন্দম।

অরিন্দম। না, না, তুমি বুঝছো না—এ আমার অভিমানের কথা নয়, এ আমার প্রাণের কথা। আমার মনে হয়, বাপের পয়সা ছেলে ভোগ করবে, এই নিয়মটাই অন্যায়। ওতে ছেলেদের মনুষ্যত্ব অপহরণ করা হয়।

নীরদ। তুমি বলছো কী হে! কাউকে দিয়ে যাবার না থাকলে মানুষের যে উপার্জনে উৎসাহই আসবে না। এই তো আমার ছেলেটা আমেরিকা থেকে ডেনটিস্ট্রি শিখে এসেছে—এখন তাকে যে বেশ ভালোভাবে প্র্যাকটিসে বসিয়ে দিতে পারছি, আমার সারা জীবনের পরিশ্রমের এটাই তো পুরস্কার। কী বলো?

অরিন্দম। তোমার ছেলে বিয়ে করেছে?

নীরদ। নাঃ, বিয়ের কথা কানেই তোলে না সে। কে জানে, কোথাও লভ-টভ আছে বোধ হয়। তা আমিও বেশি কিছু বলিনে—ও নিজেরা দেখে-শুনে করাই ভালো।

অরিন্দম। হ্যাঁ, তা-ই ভালো। দেখছো তো, ছেলের বিয়ে দিয়ে আমি কী-রকম বিপাকে পড়েছি। বৌটার জীবন ছারখার হ'য়ে গেলো। যদি সম্ভব হ'তো, উজ্জ্বলার আমি আবার বিয়ে দিতুম।

নীরদ (হেসে উঠে)। কী যে বলছো, অরিন্দম, আজ সত্যি তোমার কিছু হয়েছে। আচ্ছা . . . কাল সকালে আবার আসবো। নর্সকে সব বুঝিয়ে দিয়েছি—কিছু ভেবো না।

[নীরদ ডাক্তার চ'লে গেলেন। হৈমন্তী দ্রুতপায়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর পিছনে বুলি।

অরিন্দম। তুমি—বেরুচ্ছো ?

হৈমন্তী। হাঁ।

অরিন্দম। কখন ফিরবে ?

হৈমন্তী। ঠিক নেই।

অরিন্দম। গাড়ি নিয়ে যাচ্ছো ?

হৈমন্তী। তোমার অসুবিধে হবে ?

অরিন্দম। না, না—গাড়িটা তুমিই নাও।

বুলি। বাবা, তুমি না বলেছিলে আজ আমাকে নিয়ে নিউ মার্কেটে যাবে ?

অরিন্দম। যাবো রে যাবো! (বুলি ঘুরতে-ঘুরতে টেবিল থেকে একটা মাসিকপত্র তুলে নিয়ে চেয়ারে ব'সে নখ খেতে-খেতে তার মধ্যে ডুবে গেল) হ্যাঁ, এ-ক'দিনের মধ্যে টাটাকে একবার দেখবার সময় পেয়েছিলে কি ?

হৈমন্তী। অনেক তো হ'লো—আর মায়া বাড়িয়ে লাভ কী।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বুলি (হঠাৎ মাসিকপত্র থেকে চোখ তুলে)। মায়া বাড়ানোই তো ভালো, মা, তাহ'লে তুমিও একদিন মহামায়া হ'য়ে যাবে। (হৈমন্তী তীব্র দৃষ্টিতে একবার বুলির দিকে তাকালেন, কিন্তু বুলি তা লক্ষ্যও করলে না, তক্ষুনি আবার মাসিকপত্রে চোখ ডোবালো।)

অরিন্দম। বলো তো, মন্তী, সত্যি কি মায়া কাটানো যায়? এই যে তুমি রোজ রাত ক'রে ফেরো, রোজ আমার নতুন ক'রে ভয় হ'তে থাকে—কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হ'লো না তো! যে বিশ্রী যাদবপুরের রাস্তা!

হৈমন্তী। তা কিছু-একটা হ'লে মন্দ হয় কী—তুমি দিব্যি আবার বিয়ে ক'রে সুখে ঘর করতে পারো।

অরিন্দম। মন্দ বলোনি কথাটা। কিন্তু নতুনের চাইতে পুরোনোই আমার পছন্দ। এবার কিন্তু তোমাকে নাগপুরে নিয়ে যাবো।

হৈমন্তী (ক্ষীণ হাসিতে তাঁর ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেলো)। না যাই যদি?

অরিন্দম। না যদি যাও তাহ'লে আর একটা বিয়েই ক'রে ফেলবো—জয় হোক হিন্দুধর্মের!

হৈমন্তী। বেশ তো, করো না।

অরিন্দম। কপালগুণে নিতান্ত অনুগত স্বামী পেয়েছো, তাই অমন নিশ্চিন্ত সুরে কথাটা বলতে পারলে। সত্যি যদি খবর পেতে যে কপালে সতিন সাজছে তাহ'লে কি আর কেঁদে-কেটে হাট বাধাতে না!

হৈমন্তী। সত্যি বলছি, তুমি আবার বিয়ে করলে আমি খুশিই হই।

অরিন্দম। বলো কী!

হৈমন্তী। ভাখো না ক'রে।

অরিন্দম। বুঝেছি—এই স্বামীরূপী উপদ্রবের হাত থেকে যে-কোনো রকমে রেহাই পেলেই তুমি এখন বাঁচো। তাহ'লে বিধবা হ'লেও খুশি হও।

হৈমন্তী। বা রে, তুমিই তো বললে আবার বিয়ে করবে।

অরিন্দম। আমি বলিনি, তুমিই প্রথম কথাটা তুলেছিলে। কিন্তু আমার দ্বিতীয়বার বিয়ে দেবার চেষ্টা না-ক'রে মেয়ে দুটোর বিয়ের কথা ভাবলে ভালো হয় না?

হৈমন্তী। তা হবেই একদিন বিয়ে।

অরিন্দম। এ-ভাবে চললে কোনোদিনই হয়তো হবে না।

হৈমন্তী। না-হয় না-ই হ'লো।

অরিন্দম (স্তম্ভিত হ'য়ে)। না-ই হ'লো! তুমি কি বলতে চাও ওদের কোনোদিনই বিয়ে হবে না?

বুলি (মাসিকপত্র থেকে আবার চোখ তুলে)। এ তোমার ভারি অন্যায়, মা! নিজেরা কবে বিয়ে-টিয়ে ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছো, আর এখন আমাদের বিয়ে দেবার নামও নেই।

[অরিন্দম উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। হৈমন্তী তীব্রতর দৃষ্টিতে ছোটো মেয়ের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে ব'লে উঠলেন :]

হৈমন্তী। বুলি! যা এখান থেকে!

বুলি। যাচ্ছি, যাচ্ছি। আমি কোনো কথা বললেই দোষ—না?

[বলতে-বলতে উঠে দাঁড়িয়ে বাবার দিকে একবার সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাসিকপত্রটা হাতে নিয়েই অভিমানের ভঙ্গিতে বুলি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো]

অরিন্দম (একটু পরে)। খামকা বকলে কেন মেয়েটাকে? কথাটা ও তো ঠিকই বলেছে। আমার মনে হয় ওদের এখন বিয়ে হওয়াই দরকার—মিনির তো এক্ষুনি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হৈমন্তী। মিনির নিজের মত অন্যরকম হ'তে পারে।

অরিন্দম। ও মুখে যাই বলুক, ওর মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছি।

হৈমন্তী। তাহ'লে তুমিই যা হয় ব্যবস্থা করো। সেকেলে লোকদের মতো মেয়ের বিয়ের জন্য পাগল হ'য়ে যাওয়া—আমি ওর মধ্যে নেই।

অরিন্দম। ও, বিয়ে জিনিশটা বুঝি সেকেলে হ'য়ে গেছে?

হৈমন্তী। ওরা নিজেরা বড়ো হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, যা ভালো বোঝে করবে। আমরা কিছুই বুঝতুম না—বাপ-মা বিয়ে দিয়েছেন, বিয়ে হ'য়ে গেছে। জানলে কি আর বিয়ে করি!

অরিন্দম। কী জানলে? কী সেই দিব্যজ্ঞান, যা লাভ করলে তুমি তোমার বরমাল্য দিয়ে এই অভাগাকে ধন্য করতে না? (হৈমন্তী চুপ) ও, তাহ'লে তুমি বিয়ে ক'রে অসুখী হয়েছো—সেইজন্যই মেয়েদের আর বিয়ে দিতে চাও না?

হৈমন্তী। আমার কথা ছেড়ে দাও—আমার আবার সুখ আর দুঃখ!

অরিন্দম। তোমাকে হাড়-কুড়মুড়ে ব্যামোয় ধরেছে, দেখছি। কোনোদিন তো দুঃখ পেলে না, তাই দুঃখ পাবার শখ হয়েছে!—তোমার কোনো কথা আমি শুনবো না, এবার আমার সঙ্গে তোমাকে নাগপুরে নিয়ে যাবোই।

হৈমন্তী (ক্ষীণ হেসে)। জো হুকুম।

অরিন্দম। ঠাট্টা নয়, মন্তী। আমি ভেবে দেখেছি, স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় বিপত্নীক হ'য়ে থাকবার কোনো মানে হয় না।

হৈমন্তী। বাড়িতে পা দিয়েই ছেলেকে তাড়িয়েছো, বুলির পণ্ডিত মশাইকে বিদেয় দিয়েছো, চাকরবাকরদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছো—আর এখন আমার উপর কর্তাগিরি না-ফলালে বুঝি তোমার চলছে না?

অরিন্দম। তোমাকে ছাড়া আমার কিছুই চলে না, মন্তী।

হৈমন্তী (চপল সুরে)। ও-কথা আর কেন? আমাকে নিয়ে কোনো সুখই তোমার হ'লো না—এবার আমাকে তুমি ছেড়ে দাও।

অরিন্দম। তোমাকে ছেড়ে দেবো! (হেসে উঠলেন)

হৈমন্তী। ছেড়ে দিতে হবে বইকি। অর্ধেক জীবন কাটলো তোমার সংসারের দাসী হ'য়ে—

অরিন্দম। দাসী, মন্তী? না, না—রানি, রানি।

হৈমন্তী। রানিও যা, দাসীও তাই। তোমার এই সংসারে আমার সমস্ত জীবন বিকিয়ে দিয়েছিলাম—

অরিন্দম। সংসার আমার নয়, মন্তী, তোমারই। তুমিই সংসার। অনেক করেছো তুমি, অনেক দিয়েছো আমাকে—কিন্তু আমিও কি তোমার ঋণ দিনে-দিনে তিলে-তিলে শোধ করিনি?

হৈমন্তী। দয়া ক'রে ঐ কথাগুলো আর আউড়িয়ো না। শুনে-শুনে কান প'চে গেছে।

অরিন্দম (ব্যথিত, অথচ সস্নেহ সুরে)। তোমার মাথা-খারাপ হয়েছে, মন্তী।

হৈমন্তী। না, মাথা আমার মোটেও খারাপ হয় নি। তুমি ভেবেছো ঐ সব মন্ত্র জপিয়ে এখনো আমাকে ভোলাতে পারবে? না, না। স্বামী, সন্তান, সংসার—এ-সব শৃঙ্খল তো বহুদিন বহন করে বেড়ালুম—কিন্তু আর না, আর আমি পারবো না। মুক্তির পথ দেখতে পেয়েছি আমি—কেউ আর আমাকে বাঁধতে পারবে না।

[হৈমন্তী কথা শেষ ক'রেই, অরিন্দমকে জবাব দেবার সময় না দিয়েই দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন।

অরিন্দম চুপ ক'রে একটু দাঁড়িয়ে রইলেন—তাঁর মুখ বিস্মিত বেদনায় বিবর্ণ—তারপর আস্তে-আস্তে ভিতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

একটু পরে বাইরের দরজা দিয়ে ঢুকলো সুবেশ সুন্দর নিরঞ্জন। ঘরে কাউকে দেখতে না-পেয়ে সে একটু ইতস্তত করছে, এমন সময় সেই মাসিকপত্রটি হাতে নিয়ে অত্যন্ত সহজ ঘরোয়া ভঙ্গিতে বুলি এসে ঢুকলো। নিরঞ্জনকে দেখে সে ঈষৎ থম্‌কে দাঁড়ালো, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো তার মুখ।]

বুলি। আপনি কখন এলেন?

নিরঞ্জন। এক্ষুনি এলুম।...বাড়িতে কেউ নেই?

বুলি। এই যে আমি আছি। বসুন। (তার ভঙ্গিটা হঠাৎ একটু আত্মসচেতন ও সলজ্জ হ'য়ে উঠলো।)

নিরঞ্জন। তোমার জন্যে একটা জিনিশ এনেছি। (ব্রাউনপেপারে জড়ানো একটা বাক্স তার হাতে ছিলো—সেটা দিলে বুলিকে।)

বুলি (লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠে)। আমার জন্যে? আমার জন্যে কেন? কী এটা?

নিরঞ্জন। খুলেই ছাখো। (বুলি বাক্সটা হাতে নিয়ে খামকা নাড়াচাড়া করতে লাগলো) দাও, আমিই খুলে দিই। (বুলির হাত থেকে বাক্সটা টেনে নিলে। ব্রাউনপেপারটা খুলে ফেলতেই বেরিয়ে এলো রঙিন ছবি আঁকা একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স।)

বুলি (কিছু সলজ্জে, কিছু সোৎসাহে)। ওমা, এ যে চকোলেট!

নিরঞ্জন। তা-ই তো মনে হচ্ছে।

বুলি। আমার জন্যে চকোলেট এনেছেন কেন? আমি কি এখনো ছেলেমানুষ আছি নাকি?

নিরঞ্জন। তা বড়োরাও মাঝে-মাঝে চকোলেট খায়।

বুলি। আমি তো খুব ভালোই বাসি।

নিরঞ্জন। তাতে লজ্জার কিছু নেই।...এসো, নাও একটা। (বাক্সর ডালা খুলে বুলির দিকে এগিয়ে দিলে। নানা রঙের রাংতায় মোড়া নানা আকৃতির চকোলেট ইলেকট্রিক আলোয় চিকচিক ক'রে উঠলো।)

বুলি। (আঙুল বাড়িয়েও থেমে গিয়ে) আপনি খাবেন না?

নিরঞ্জন। আমিও খাচ্ছি।

[একটা চকোলেটের রাংতা ছাড়িয়ে নিয়ে নিরঞ্জন আস্তে কামড় দিলে। তার দেখাদেখি বুলিও ঠিক একটি চকোলেট তুলে নিয়ে আস্তে ছাড়িয়ে খুব ভদ্রভাবে কামড় দিলে]

নিরঞ্জন। দিদির শিক্ষায় এ-ক'দিনেই তোমার বেশ উন্নতি হয়েছে, দেখছি।

বুলি। হয়েছে নাকি?

নিরঞ্জন। কী-রকম ভদ্রভাবে চকোলেট খাচ্ছো! সেবারে যখন আসতুম একসঙ্গে গোটা চারেক মুখে না-দিলে তোমার কিছু হ'তোই না। কত ছোটো ছিলে তুমি তখন—দু' বছরেই মস্ত বড়ো হ'য়ে গেছো।

বুলি। আপনি এ-ক'দিন আসেননি যে?

নিরঞ্জন। বাঃ, রোজই আসতে হবে নাকি?

বুলি। এলেনই বা।

নিরঞ্জন। তুমি বলছো রোজ আসতে?

বুলি (হঠাৎ আত্মসচেতন হ'য়ে)। রোজ মানে—এই মাঝে-মাঝে যদি আসেন—বেশ গল্প-টল্প করা যায়।

নিরঞ্জন। কিন্তু তাতে তোমার পড়াশুনোর ক্ষতি হবে না তো?

বুলি (ঠোঁটে ঠোঁট চেপে, মাথা নেড়ে) ন্‌না। (চাপা হাসির আভা তার মুখে, বুকের উপর লুটিয়ে-পড়া বেণী দুটি মাথা নাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে দুলে উঠলো। মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলো নিরঞ্জন)।

নিরঞ্জন (একটু পরে, আত্মস্থ হ'য়ে)। কেন তোমার পণ্ডিত মশাই—

বুলি। ওঃ, সে-ভাবনা আর নেই। বাবা তাঁকে ব'লে দিয়েছেন তাঁকে আর আসতে হবে না।

নিরঞ্জন। তাহ'লে তো তোমার খুব সুবিধেই হ'লো। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছো কি?

দ্বিতীয় দৃশ্য

বুলি (নখ কামড়াতে-কামড়াতে চোখ দিয়ে জিজ্ঞাসার ভঙ্গি করলে)।

নিরঞ্জন। এই নখ কামড়াবার অভ্যেসটা তোমাকে ছাড়তেই হচ্ছে, বুলি। (বুলি লজ্জিতভাবে মুখ থেকে হাত নামিয়ে নিলে।)

বুলি। কী কথা ?

নিরঞ্জন। পণ্ডিত মশাই তো আর আসবেন না—এখন তোমার পড়াশুনো চলবে কেমন ক'রে ?

বুলি। চলবে না ! পড়াশুনো বন্ধ। বাবা বলেছেন কলেজ থেকেও আমাকে ছাড়িয়ে আনবেন। ডু ফুর্তি ! (হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো।)

নিরঞ্জন (কৌতুকের চোখে বুলির দিকে একটু তাকিয়ে থেকে)। বাঃ, মুখ্যু হ'য়ে থাকবে ?

বুলি। থাকলামই বা। মুখ্যু হ'লেই কি বোকা হয় ? একজন বুদ্ধিমান মূর্খ, আর একজন বোকা পণ্ডিত—এর মধ্যে কে ভালো আপনার মতে ? (নিরঞ্জন কিছু বললে না) আর তাছাড়া, এবার আমি নাগপুর চ'লে যাচ্ছি বাবার সঙ্গে।

নিরঞ্জন (নিচু গলায়, একটু যেন চিন্তিত সুরে)। তোমার বাবা কবে ফিরছেন ?

বুলি। মাসখানেক পরে।

নিরঞ্জন (তার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক পরদায় ফিরে এলো)। ও, মাসখানেক। আমিও মাসখানেক আছি। এ-ক'দিন তোমাকে পড়িয়ে দিই, কী বলো ?

বুলি (মাথা ঝেঁকে)। আমি আপনার কাছে পড়বোই না।

নিরঞ্জন। কেন বলো তো ?

বুলি। আপনাকে দেখলেই গল্প করতে ইচ্ছে করবে। পড়া হবে না।

নিরঞ্জন। ভেবে ছাখো, খুব ভালো একজন মাষ্টার হাতছাড়া হ'য়ে যাচ্ছে।

[অকস্মাৎ মিনির প্রবেশ। নিরঞ্জনকে সে যেন দেখতেই পেলো না। বুলির দিকে তাকিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বললে :]

মিনি। বুলি! কী করছিস এখানে?

বুলি। এই তো নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলাম। কিন্তু তুই এসে গেলি···এখন আমি এক ছুটে কাপড়টা বদ্‌লে আসি। নিরঞ্জনবাবু, আপনি আবার পালাবেন না চট ক'রে। (ছুটে বেরিয়ে গেলো)

মিনি (যেন হঠাৎ নিরঞ্জনকে দেখতে পেয়ে)। এ কী! আপনি! আবার আপনার দেখা পাবো আশা করিনি। কী সৌভাগ্য আমাদের!

নিরঞ্জন। কিন্তু আমার কত বড়ো দুর্ভাগ্য যে আপনার দেখা আজকাল প্রায় পাওয়াই যায় না।

মিনি। আপনাকে তো বলেছি আজকাল আমি অত্যন্ত ব্যস্ত।

নিরঞ্জন (গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে)। তাই দেখছি। দয়া ক'রে অরুণকে একটু ডেকে দেবেন?

মিনি। দাদা বাড়ি নেই।

নিরঞ্জন। বাড়ি নেই!

মিনি। কেন, এতে অবাক হবার কী আছে? বাড়ি থেকে কি কেউ কখনো বেরোয় না?

নিরঞ্জন (অন্যায় তিরস্কার হজম ক'রে)। না, আমাকে বলেছিলো কিনা এ-সময়ে থাকবে।

মিনি (রুদ্ধস্বরে)। আপনার সঙ্গে দাদার দেখা হয়েছিলো?

নিরঞ্জন। কেন, এতেই বা অবাক হবার কী আছে? কারো সঙ্গে কি কারো দেখা হয় না?

মিনি (নিজেকে সামলে নিয়ে)। না—এমনি জিগেস করছিলুম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিরঞ্জন। কাল খেলার মাঠে আমাকে বললে আজ সন্ধেবেলা নিশ্চয়ই বাড়ি থাকবে—আমার একটু দরকার ছিলো কিনা ওর সঙ্গে। কখন বেরিয়েছে?

মিনি (ক্ষীণস্বরে)। দুপুরবেলাই বেরিয়েছে।

নিরঞ্জন। তাহ'লে এক্ষুনি হয়তো এসে পড়বে। একটু অপেক্ষা করি।

[চমৎকার কুঁচোনো ধুতি আর চাঁপা ফুলের রঙের গরদের পাঞ্জাবি প'রে অরিন্দম এসে ঢুকলেন। এই ফাঁকে মিনি চট ক'রে বেরিয়ে গেলো। নিরঞ্জন সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো।]

অরিন্দম। এই যে নিরঞ্জন, ভালো তো? তুমি নাকি বর্মা যাচ্ছো?

নিরঞ্জন। যাচ্ছি মানে যেতে হচ্ছে।

অরিন্দম। তা বেশ তো। বর্মাতে কোথায়?

নিরঞ্জন। চীন সীমান্তের কাছাকাছি নতুন একটা তেলের খনি বেরিয়েছে—সেখানে পাঠাচ্ছে।

অরিন্দম (সপ্রশংস দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে)। বাঃ, এই তো চাই। পুরুষমানুষের ভাগ্য ঘরের কুলুঙ্গিতে তোলা থাকে না, তাকে খুঁজতে পথে বেরোতে হয়।

[রুপোলি বুটি তোলা একখানা ঢাকাই নীলাম্বরী প'রে, আড়াই ইঞ্চি হীলের খটখট শব্দ করতে-করতে বুলি এসে ঢুকলো। কানে খুব অভিনব ধরণের আভরণ, গলায় পাথরের মালা। নিরঞ্জন অবাক হ'য়ে গেলো তাকে দেখে। এ যেন অন্য মানুষ। উঁচু হীলে তাকে অনেকটা বেশি লম্বা দেখাচ্ছে, আঁটো জামাকাপড়ে শরীরও দেখাচ্ছে ভরা-ভরা—সে যে যুবতী, এমনকি সে যে সুন্দরী, এ-কথাটা বড়োই স্পষ্ট হ'য়ে ফুটেছে।]

বুলি। চলো, বাবা।

অরিন্দম (মুচকি হেসে)। খুব সেজেছিস তো।

বুলি। ওঃ একখানা শাড়ি পরলেই বুঝি সাজা হ'লো ! তাও তো ঠোঁটে গালে নখে ভুরুতে ছবি আঁকিনি।

অরিন্দম। তুই ও-সব রং-টং লাগাস নাকি ?

বুলি। সব মেয়েই লাগায় আজকাল—আমিও শুরু করবো। মার্কেটে আজই আমায় কিনে দেবে সব।

[নিরঞ্জন বুলির দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে ।]

অরিন্দম (নিরঞ্জনকে)। ও-পাড়ায় তোমার কোনো কাজ থাকলে আসতে পারো আমার সঙ্গে।

নিরঞ্জন (কুণ্ঠিতভাবে)। অরুণের সঙ্গে একটু দরকার ছিলো আমার—

অরিন্দম। অরুণের সঙ্গে !

নিরঞ্জন। ভাবছিলুম আরো একটু অপেক্ষা করবো কিনা—

অরিন্দম। অরুণের সঙ্গে দরকার ?

নিরঞ্জন (অরিন্দমের প্রশ্নের সুরে একটু ঘাবড়ে গিয়ে)। না, না—সে-রকম কিছু নয়—

অরিন্দম (ঠোঁটে ঠোঁট চেপে)। ও। (একটু পরে) তোমার যা দরকার তা যদি আমাকে দিয়ে চলে আমাকেও বলতে পারো।

নিরঞ্জন (অত্যন্তই কুণ্ঠিত হ'য়ে)। না, না—দরকার তেমন-কিছু নয়, আর অরুণ একটু পরেই হয়তো এসে পড়বে।

[বাপের সঙ্গে মেয়ের একবার চোখাচোখি হ'লো]

বুলি। বলা যায় না—ফিরতে অনেক রাতও হতে পারে ! আপনি চলুন না আমাদের সঙ্গে—বেশ হবে, খুব মজা হবে।

নিরঞ্জন (বুলির দিকে একবার তাকিয়ে, সন্দিগ্ধভাবে)। আমি বরং একটু বসি।

অরিন্দম। আচ্ছা, আমরা চলি। আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অরিন্দম মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বুলি যেতে-যেতে ঘাড় ফিরিয়ে একবার নিরঞ্জনের দিকে তাকালো, নিরঞ্জন চোখ নামিয়ে নিলে।

একা নিরঞ্জন চুপ ক'রে একটু দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর কোণের টেবিল থেকে একটা মাসিক পত্র তুলে নিয়ে ব'সে-ব'সে পাতা ওল্টাতে লাগলো।

একটু পরে মিনির প্রবেশ। তার পরনে সেই শাদাশিধে কাপড়, বোধ হয় রান্নাঘরে ছিলো, কপালে ঘামের ফোঁটা চিকচিক করছে।]

মিনি। ও! আপনি এখনো যাননি!

নিরঞ্জন (গম্ভীরভাবে)। অরুণের অপেক্ষায় ব'সে আছি।

মিনি (রুদ্ধস্বরে)। আপনাকে আমার একটা কথা বলবার ছিলো।

নিরঞ্জন। আমাকে! (ব্যাপারটা যেন একেবারেই অসম্ভব, এই রকম একটা ভাব তার মুখে ফুটে উঠল।)

মিনি (নিচের ঠোঁট কামড়ে চুপ ক'রে রইলো—তার দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে)।

নিরঞ্জন (একটু অপেক্ষা ক'রে)। আপনি কি কোনো কারণে আমার উপর রাগ করেছেন?

মিনি (হঠাৎ—তীব্রস্বরে)। রাগ! রাগ কিসের?

নিরঞ্জন। আমি তাহ'লে আপনার রাগেরও যোগ্য নই? দয়া ক'রে বলবেন, কী অপরাধ আমি করেছি যার জন্য—

মিনি (যে-কথাটা এতক্ষণ সে বলবার চেষ্টা করছিলো এইবার হঠাৎ সেটা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো)। একটা কথা আপনাকে জিগেস করি—বুলি নিতান্ত ছেলেমানুষ, ওর সঙ্গে আপনার এত কী কথা?

নিরঞ্জন (ঈষৎ হেসে)। ওর সঙ্গে গল্প করতে আমার বেশ লাগে।

মিনি (আঁচলে মুখ মুছে)। বুলির দিকটা ভেবে দেখেছেন?

নিরঞ্জন। আমার তো মনে হয়েছে ওরও কিছু খারাপ লাগে না।

মিনি। যা ভালো লাগে তাই কি সব সময় ভালো?

নিরঞ্জন। জানি না। বলেন তো এ-বিষয়ে আপনার কাছে পাঠ নেবো। কিন্তু তার আগে একটা কথা আপনাকে জানাতে চাই। আমার সম্বন্ধে কোনো কথা আপনার কানে যদি উঠে থাকে—

মিনি (চমকে তাকিয়ে)। বুলিটা আপনাকে কিছু বলেছে বুঝি?

নিরঞ্জন। না তো! বুলি বলবে কেন? আপনার ব্যবহারেই বুঝতে পারছি।

মিনি। কী বুঝতে পারছেন?

নিরঞ্জন। বুঝতে পারছি, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। কিন্তু এইটে আপনি জেনে রাখুন যে আপনি যা শুনেছেন তা সম্পূর্ণ ভুল, একেবারেই মিথ্যে।

মিনি। মিথ্যে! (যেন আর কী বলবে ভেবে না-পেয়ে অনিশ্চিত ভাবে শাড়ির আঁচলটা হাতের আঙুলে জড়াতে আর খুলতে লাগলো।)

নিরঞ্জন। মিথ্যে বইকি। আপনি কি কিছুই বোঝেন না? একটু আগে আপনি জিগেস করছিলেন, বুলির সঙ্গে আমার এত কী কথা। (বলতে-বলতে নিরঞ্জন উঠে দাঁড়ালো) আমার মনের মধ্যে কত কথা যে ছটফট ক'রে মরছে, কত কথা এই দু'বছর নিজের কাছ থেকেও আমি লুকিয়ে রেখেছি—

মিনি (বিবর্ণ মুখে বাধা দেবার ভঙ্গিতে হাত তুললো, হয়তো কিছু বলতেও যাচ্ছিলো, কিন্তু তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না।)

নিরঞ্জন (মিনির ভঙ্গি অগ্রাহ্য ক'রে)। সেই সব কথা আজ বেরিয়ে পড়বার জন্য খেপে গেছে। যাকে বলতে চাই তাকে কাছে পাইনে, যাকে কাছে পাই, তাকেই বলি—(মিনির গলা দিয়ে আর্তস্বরের মতো একটা আওয়াজ বেরুলো—নিরঞ্জন মিনির খুব কাছে দাঁড়িয়ে

ভোড়ে ব'লে চললো) লাহোর থেকে যখন এলুম, সমস্তটা পথ আমার বুকের মধ্যে থেকে-থেকে যেন একটা সুখের পাখি ডেকে উঠেছে—সে কিসের জন্য ? শুধু কি কলকাতায় ফিরবো ব'লে ? তা তো নয়, বার-বার একটি মানুষের মুখই আমার মনে পড়েছে—তার হাসি, তার কথা—

মিনি (কানে আঙুল দিয়ে—বিকৃতস্বরে)। না—না—না।

নিরঞ্জন। তারপর সেদিন এ-বাড়িতে যখন এলুম, এসে দেখলুম—

মিনি। না—না—আর বলবেন না—

[মিনি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তার গলা বুজে এলো। বুকের উপর তার দুটি হাত জোড় করা, চোখ আধো বোজা, ঠোঁট ঈষৎ খোলা, মুখটি উপরের দিকে তোলা, লম্বা কালো চুল পিঠ বেয়ে পড়েছে।]

নিরঞ্জন। এসে দেখলুম, সবই যেন বদলে গেছে। কিন্তু সত্যি কি বদলেছে ? এই কথাটি কি আজ আমি জেনে যেতে পারবো না যে আমি এতদিন মনে-মনে যা জেনেছি তা মিথ্যে নয় ?

মিনি। মিথ্যে—মিথ্যে !

নিরঞ্জন। আগাগোড়াই মিথ্যে ?

মিনি। আগাগোড়া মিথ্যে ! আগাগোড়া ভুল ! দু'বছর আগে আপনি যাকে দেখেছিলেন, সে মানুষ আমি নই। আমার নতুন জন্ম হয়েছে। সংসার আমাকে বাঁধবে না, সম্ভোগ আমাকে টানবে না, রঙিন পুতুলের খেলাঘরে বন্দী হবো না আমি, মুক্ত হবো তুচ্ছ সুখ-দুঃখ থেকে, মগ্ন হবো সেই আনন্দে, যার শেষ নেই, যার ক্ষয় নেই। (কথাগুলি মিনি মৃদুস্বরে গুন গুন ক'রে বললে, যেন এ দিয়ে নিজেকেই সম্মোহিত করতে চায়। তারপর হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে) আপনি এ-সব কথা বুঝবেন না। আপনি যান।

নিরঞ্জন (স্তব্ধ হ'য়ে, একটু দাঁড়িয়ে থেকে)। তাহ'লে আমারই ভুল হয়েছিলো।

মিনি। আপনি যান।

নিরঞ্জন। আর কিছুই কি বলবার নেই।

মিনি (আর্তস্বরে)। না—না—কিছু নেই, কিছু নেই—আর আমাকে কষ্ট দেবেন না—আপনি যান।

নিরঞ্জন (ভারি গলায়)। যাচ্ছি।

[নিরঞ্জন চ'লে গেলো। মিনি একটা চেয়ারে ব'সে প'ড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকলো। তার কাঁধ দুটো কেঁপে উঠলো।]

ধীরে যবনিকা নেমে এলো

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কয়েকদিন পরে

[মায়া-মন্দিরে মা-মহামায়া যে-বাড়িতে থাকেন, সেটি ভক্তদের মতে স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝখানকার সেতু, তাই তার নাম সেতুবন্ধ।

ছোটো দোতলা বাড়ি। দোতলায় উঠেই মূল্যবান মার্বেলের চওড়া বারান্দা। বারান্দা পেরিয়ে পাশাপাশি দুটি ঘর, তার দরজা ভারি পরদা দিয়ে ঢাকা।

ঐ বারান্দায় বিকেলের ঝিকিমিকি-আলোয় মা-মহামায়া ব'সে, তাঁকে ঘিরে হৈমন্তী, উজ্জ্বলা, মিনি। মহামায়া ভক্তদের সঙ্গে সমান হ'য়েই বসেছেন, তাঁর জন্য আলাদা কোনো আসন নেই, বেদী নেই, আশেপাশে কোনো মূর্তি কি ছবি নেই—বারান্দাটি অত্যন্ত নিরাভরণ, পরিচ্ছন্ন ও মনোরম।

মহামায়ার পরনে টকটকে লাল পাড়ের শাড়ি, কপালে জলজলে সিঁদুরের ফোঁটা, তাঁর চোখ তীক্ষ্ণ, হাসি মধুর। মানুষী জীবনে তিনি যাঁকে বিবাহ করেছিলেন সেই ব্যক্তি পাশে দাঁড়িয়ে। বেঁটেখাটো ষণ্ডামার্ক চেহারা, মুখভরা কাঁচাপাকা দাড়ি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, লাল রঙের কাপড় পরনে, চোখের রংও তা-ই। ভক্তদের মধ্যে কেউ-কেউ বাবা-মহাদেব জ্ঞানে তাঁকে ভক্তি করে, কেউ বা সাধারণ পুজুরি বামুন ভেবে তাঁকে অবজ্ঞা করে। মায়া-মন্দিরের সমস্ত কাজকর্ম বিষয়ব্যাপারের দেখাশোনা সাংসারিক মানুষের মতোই অত্যন্ত নিপুণভাবে তিনি

করেন, আবার দাড়ি রেখে, গেরুয়া প'রে, অত্যন্ত কম কথা ব'লে, মহাদেবে আরোপিত দু'একটা নেশা অভ্যেস ক'রে কিঞ্চিৎ দেবত্বও বজায় রাখেন।

যবনিকা উঠতে দেখা গেলো উজ্জ্বলা মহামায়ার পা জড়িয়ে ধ'রে প'ড়ে আছে]।

উজ্জ্বলা। মা, ওকে তুমি বাঁচাও। (ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো)

মহামায়া (উজ্জ্বলার মাথায় হাত রেখে)। ছি, উজ্জ্বলা, অমন করতে নেই।

হৈমন্তী। উঠে বোসো, উজ্জ্বলা, অত ব্যাকুল হোয়ো না।

[উজ্জ্বলা উঠে বসলো। চোখের জলে কালো হ'য়ে গেছে মুখ, মাঝে-মাঝে ফোঁসফোঁস ক'রে কান্না ঠেলে উঠছে বুকের ভিতর থেকে।]

মহামায়া। ডাক্তার কী বলে?

হৈমন্তী। ডাক্তার তো কতই বলে।

মহামায়া (মৃদু হেসে)। না রে, ওদের সব কথাই যে বাজে তা কিন্তু ভাবিসনে। কিছু আছে ওদের, কিছু ওষুধপত্রও আছে। যেমন ধর, তোর যদি কালাজ্বর হয় আমি তোকে ওদের ঐ ছুঁচগুলোই ফোটাতে বলবো।

হৈমন্তী (মুগ্ধ হয়ে)। আশ্চর্য তোমার উদারতা, মা। এদিকে কোনো ডাক্তারের সামনে দৈব ওষুধের নামও কি মুখে আনতে পারবো! এতেই তফাৎ বোঝা যায়।

মহামায়া। কী বলে ডাক্তার?

হৈমন্তী। সে-কথা আর বলো কেন, মা, ওদের তো যা মুখে আসে ব'লে দিলেই হ'লো! অরুণকে নাকি কী এক কুৎসিত ব্যামোয় ধরেছে। তাই জন্যেই ছেলেটা—ছি ছি, এ সব কথা ভাবতেও ঘেন্না করে!

(মিনি উজ্জ্বলা দু'জনেই মাথা নিচু করলো) ব্যামো হ'লো অরুণের, আর তাতে ভুগছে তার ছেলে—এটা কোন দিশি শাস্ত্র বলো তো, মা।

মহামায়া। কিছু বাজে কথা না-বললে ওদের চলে না, তা তো জানিস। একবার এক ডাক্তার তো আমার দেহে যক্ষ্মার বীজাণুই আবিষ্কার করলে। (বাবা-মহাদেবের দিক কটাক্ষপাত ক'রে) একজন মানুষ তো ভেবেই অস্থির—যেন মরতেই বসেছি। মরলুম না তো। যক্ষ্মারও দেখা নেই। এই রকম আরকি।

হৈমন্তী (মহামায়ার নিটোল উজ্জ্বল কান্তির দিকে তাকিয়ে—মুগ্ধস্বরে)। তুমি তাহ'লে সাধনার বলে যক্ষ্মাকেও জয় করেছো! তোমার অসাধ্য কিছু নেই, মা।

মহামায়া। ঐ খানেই তোরা ভুল করিস। জন্মের মুহূর্ত থেকেই মৃত্যুকে আমরা আপন দেহের মধ্যে বহন করি, মা যেমন সন্তানকে বহন করেন। মা-র দেহ দীর্ণ ক'রে সন্তান যেমন বেরিয়ে আসে, তেমনি মৃত্যু তো একদিন প্রকাশিত হবেই।

হৈমন্তী। কী যে বলো, মা, তোমার আবার মৃত্যু!

মহামায়া। মরতে হবে বইকি, সকলকেই মরতে হবে। তুই কী বলিস, মিনি।

মিনি (আরক্ত মুখে মহামায়ার চরণ স্পর্শ ক'রে)। আমাকে শান্তি দাও, মা।

মহামায়া। তোর আবার অশান্তি কিসের? ফুল হ'য়ে ফুটবি তুই—তোকে দেখে বিশ্বের লোক শান্তি পাবে।

মিনি। পারি না, মা, পারি না। তোমার কথা যখন শুনি, মনে হয় আমার জন্ম-জন্মান্তর ধন্য হ'য়ে গেলো, কিন্তু যখনই দূরে স'রে যাই—

মহামায়া। তোদের মন যে মাঝে-মাঝে উদ্‌ভ্রান্ত হয় সেখানেই তো

আমার জিৎ। নয়তো ফিরে-ফিরে আমার কাছে আসবি কেন তোরা? আর তোদের কাছে না-পেলে আমি তো ব্যর্থ।

মিনি (গদ্‌গদস্বরে)। মা, আমাকে আশীর্বাদ করো। (আর-একবার প্রণাম ক'রে করজোড়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে ব'সে রইলো।)

উজ্জ্বলা (ক্ষীণস্বরে)। মা, তুমি আমাকে কথা দাও আমার ছেলেকে তুমি বাঁচাবে।

মহামায়া। আমি তো কিছুই পারিনে, উজ্জ্বলা।

উজ্জ্বলা। তুমি সব পারো, মা, তুমি সব পারো। কী যে কষ্ট পাচ্ছে—আর চোখে দেখা যায় না।

মহামায়া। কষ্ট কখনো পায়নি এমন জীব কোথায়?

উজ্জ্বলা। ও নিষ্পাপ শিশু—ওর এই কষ্ট কেন? (বলতে-বলতে উজ্জ্বলার চোখ আবার ছলছলিয়ে উঠলো।)

মহামায়া। আমরা কতটুকু জানি! কতটুকু বুঝি! আমাদের বানর-জন্মের কথা এখন কি আর আমাদের মনে পড়ে! কোন জন্মের পাপে আজকের এই দুঃখ তা কে বলবে!

উজ্জ্বলা। ওকে তুমি বাঁচাও, মা, ওকে তুমি বাঁচাও। এ আমি আমার সুখের জন্য বলছি না—আমার জীবনে সুখ নেই তা আমি জানি। এই তুমি করো, মা, ও যেন বেঁচে ওঠে, আর আমি যেন মরি। আমি যেন মরি। (মহামায়ার পায়ের উপর মাথা লুটিয়ে বিকৃতস্বরে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।)

মহামায়া (উজ্জ্বলার মাথায় হাত রেখে)। অমন কোরো না, উজ্জ্বলা।

উজ্জ্বলা (কান্নার ভিতর দিয়ে ভাঙা-ভাঙা গলায়)। কী হবে আমার বেঁচে! কেন আমি জন্মেছিলাম—কেন আমি জ'ন্মেই ম'রে যাইনি। কোনো কাজে লাগলুম না—কাউকে সুখী করতে পারলুম

না। (কান্নায় তার বাকি কথা ডুবে গেলো। একটু সময় তার কান্না ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা গেলো না।)

মহামায়া (আশ্চর্য স্নিগ্ধস্বরে)। তোমার স্বামীর জন্য চিন্তা কোরো না। সে ভালোই আছে।

উজ্জ্বলা (চমকে মুখ তুলে তাকালো)।

মহামায়া। ভালোই আছে সে। তার জন্য ভেবো না।

উজ্জ্বলা (মর্মান্তিক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে)। পাপী মন আমার, সংসারের জ্বলুনি-পুড়ুনিই আমাকে টানে। মনের কোনো পাপেই তো তোমার অজানা নেই, মা; তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি কখনো ফিরবেন না?

মহামায়া (মধুর হেসে)। ফিরবে বৈ, ফিরবে। অমন বাড়ি, এমন টুকটুকে বৌ—কদ্দি'ন থাকবে আর এ-সব ফেলে?

উজ্জ্বলা (একটু যেন শান্ত হ'য়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহামায়াকে প্রণাম করলে। তারপর শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে) আমি কি এখন চ'লে যাবো?

হৈমন্তী। না, না, এখুনি যাবে কী—তুমি কাছে ব'সে থাকলেই তো আর তোমার ছেলে সেরে উঠবে না—মা-র দয়া হ'লে সবই হবে। আজ অনঙ্গ ঠাকুর রাসলীলা গাইবেন—শুনলে তোমার মন কত ভালো হ'য়ে যাবে দেখো। চল্, মিনি। (মিনি মহামায়াকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালো। হৈমন্তীও প্রণাম করতে যাচ্ছিলেন, মহামায়া বাধা দিয়ে বললেন :)

মহামায়া। তোকে না আমি বারণ ক'রে দিয়েছি প্রণাম করতে।

হৈমন্তী (বিহ্বলস্বরে)। মা! (এক তোড়া নোট বের ক'রে মহামায়ার পায়ের কাছে রাখলেন)

মহামায়া। এ সব আবার কী? এর পর আমি সত্যি কিন্তু রাগ করবো, হৈমন্তী।

হৈমন্তী। বার-বার এমন ক'রে আমার মনে কষ্ট দিয়ো না, মা।

মহামায়া। এ যদি আমার কোনো কাজে লাগতো তোর কাছে চেয়েই নিতুম। কিন্তু তুই তো জানিস আমার কোনোই দরকার নেই।

হৈমন্তী। দরকার তোমার নয়, মা, দরকার আমাদের। (মহাদেব এগিয়ে এসে নোটের তোড়াটি কুড়িয়ে নিলেন। তারপর আর-কোনো দিকে না-তাকিয়ে বেরিয়ে গেলেন।)

হৈমন্তী। একটা কথা বলি, মা, কিছু মনে কোরো না। বাবা মহাদেব তোমার পাশে আছেন ব'লেই মায়া-মালঞ্চ চলছে।

মহামায়া। ঐ মানুষটির কথা আর বলিসনে। মায়া-মালঞ্চের জন্য ভেবে-ভেবে ওঁর মুখের কথা পর্যন্ত বন্ধ হ'য়ে গেছে। আমি বলি, ভাবনা কিসের। মায়া-মালঞ্চ যদি ভেঙে যায় যাক না। (আধো চোখ বুজে) আমার এই দেহই তো তাঁর মন্দির, আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় তো তাঁরই পূজার পঞ্চ প্রদীপ। বেরিয়ে পড়বো পথে, তিনি কি পথের ধুলোতেই তাঁর প্রেমের আসনখানি পেতে রাখেননি ?

[মহামায়া একটু চুপ ক'রে রইলেন, অন্য সবাই মুগ্ধ হ'য়ে চুপ।]

হৈমন্তী (মহামায়া চোখ মেলে তাকাবার পর—আর্দ্রস্বরে)। যাই মা, আমরা, লীলামঞ্চে বসি গিয়ে ?

মহামায়া। একটু দাঁড়া, হৈমন্তী, তোর সঙ্গে একটু কথা আছে।

হৈমন্তী (মিনি ও উজ্জ্বলাকে)। তোমরা লীলামঞ্চে বোসো গিয়ে— আমি একটু পরে আসচি।

[মিনি ও উজ্জ্বলা বেরিয়ে গেলো]

মহামায়া (একটু পরে)। তোর জন্য আজ একটা উপহার রেখেছি।

হৈমন্তী। উপহার, মা ? আমার জন্য ?

মহামায়া। হ্যাঁ, তোর জন্যই উপহার। একেবারে অবাক ক'রে দেবো তোকে।

হৈমন্তী। রোজই তো করছো, মা। তোমাকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি।

[মহামায়া উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের পরদা-ঢাকা দরজার দিকে তাকিয়ে ডাকলেন :]

মহামায়া। অরুণ! (হৈমন্তী চমকে উঠলেন)

[একটু পর অরুণ বেরিয়ে এলো। ফিটফাট চেহারা, পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় পরনে। ফোলা-ফোলা চোখ দেখে মনে হয় একটু আগে ঘুম থেকে উঠেছে। অরুণ বেরিয়ে এসে মাকে দেখে গোঁজ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।]

মহামায়া। দেখলি তোর ছেলের কাণ্ড!

হৈমন্তী (ছেলের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে) ওকে তুমি কোথায় পেলে, মা?

মহামায়া। নিজেই এসে ধরা দিয়েছে। পাগলের মতো চেহারা ক'রে হঠাৎ এসে উপস্থিত। বলে কিনা, এখানেই থাকবে। আমি তো অবাক।

হৈমন্তী। ও কবে এসেছে মা?

মহামায়া। এই দিন কয় হবে। আমি প্রথমে তোকে কিছু বলিনি—ভাবলুম, ছেলেটাকে খাইয়ে-পরিয়ে আগে সুস্থ করি, তারপর তোর সঙ্গেই বাড়ি পাঠিয়ে দেবো। এখন ওর যা হয় ব্যবস্থা কর তোরা।

হৈমন্তী। কী ব্যবস্থা করবো ব'লে দাও, মা।

মহামায়া। ছেলে তোর—আর ব্যবস্থা করবো আমি? পায়ে ধ'রে সেধে বাড়ি নিয়ে যা—কী আর করবি।

অরুণ (হেঁড়ে গলায়)। বাড়ি আমি ফিরবো না।

মহামায়া (মুখ টিপে হেসে)। একবারে পাগলা ছেলে তোর !

হৈমন্তী। আমি বলি কী, মা—তোমার কাছেই ও থাক কিছুদিন।

মহামায়া (হৈমন্তীর চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে)। আমার কাছে রাখবি ওকে ?

হৈমন্তী। রাখবো কিনা জিগেস করছো, মা ? ওর কি এত পুণ্য যে তোমার কাছে থাকতে পারবে !

মহামায়া (অরুণের দিকে ফিরে)। কী রে, তুই কী বলিস ?

[অরুণের মুখ দিয়ে ঘোঁৎ ক'রে একটা আওয়াজ বের হ'লো]

হৈমন্তী (তাড়াতাড়ি)। ওর কোনো কথা তুমি শুনো না, মা, ওকে তুমি জোর ক'রে ধ'রে রাখো !

মহামায়া না রে, অত শক্তি আমার নেই। কিন্তু এসে ড়লো যখন, ফেরাতে পারলুম না।

হৈমন্তী। কী ক'রে ঐ দস্যুকে তুমি বশ করলে, মা ? সাক্ষাৎ ভগবতী তুমি !

মহামায়া (একটু চুপ ক'রে থেকে)। কিন্তু ওর বাবা ব্যাপারটা শুনে রাগ করবে না তো ?

হৈমন্তী। রাগ মানে ! হুলুস্থুল বাধাবেন ! পুলিশ ডাকবেন ! ওঁকে জানাবার কোনো দরকার নেই।

মহামায়া। দরকার নেই বলছিস ?

হৈমন্তী। না, না, কিছুতে না। ওঁকে জানালে সব পণ্ড হ'য়ে যাবে।

মহামায়া। এ-সব ব্যাপার তুই-ই ভালো বুঝিস। আমার মাথায় কিছু ঢোকে না।

হৈমন্তী। উনি যে কেমন মানুষ তা আর তোমাকে বলবো কী ? না পারেন এমন কাজ নেই। এই তো শুনছিলুম, কাগজে-কাগজে নাকি

বিজ্ঞাপন দেবেন যে ছেলের কোনো ঋণের জন্যই তিনি আর দায়ী নন—বলো তো, মা, কী লজ্জার কথা! ছেলে অমানুষ হয়েছে এটা এমন ঢাক পিটিয়ে বেড়াবার কী দরকার?

[কথাটা শুনে অরুণ একবার মুখ তুলে মা-র দিকে তাকালো। মহামায়ার মুখেও সূক্ষ্ম একটু পরিবর্তন হ'লো।]

মহামায়া। এর জন্য রাগ করিস কেন, হৈমন্তী। বাপ হ'য়ে ছেলেকে শাসন না-করলে চলে! তুই কিছু ভাবিসনে, ওঁর রাগ আমি জল ক'রে দেবো।

হৈমন্তী (ব্যস্তভাবে)। আর যাই করো, মা, আমার স্বামীকে তুমি কিছু বলতে যেয়ো না। তুমি জানো না, মা, তিনি অতি ভয়ানক মানুষ।

মহামায়া (মধুর হেসে)। আমাকে দুটো কড়া কথা বলবে—এই তো! তা বললেই বা। তাই ব'লে বাপে ছেলেতে এ-রকম মনোমালিন্য থাকবে, সেটা কি ভালো? ক'টা দিন যাক—আমি একেবারে অরুণকে নিয়েই তোদের ওখানে যাবো।

হৈমন্তী (ব্যাকুলভাবে)। সেটা কি ভালো হবে, মা?

মহামায়া। ভালো হবে, খুব ভালো হবে। (পরম আশ্বাসের স্বরে) সব ঠিক হ'য়ে যাবে, হৈমন্তী।

হৈমন্তী। তুমি যা ভালো বোঝো, তাই করো, মা।

মহামায়া। তুই লীলামঞ্চে গিয়ে বোস, হৈমন্তী, একটু পরেই তো কেত্তন আরম্ভ হবে। আমি তোর পাগলা ছেলেকে পোষ মানাবার চেষ্টা করে দেখি।

[হৈমন্তী চ'লে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে মহামায়ার ধরন-ধারন বদলে গেলো। তিনি যেন ছোটো হয়ে গেলেন, ছেলেমানুষ হ'য়ে গেলেন, অরুণের মুখের দিকে মিটমিট ক'রে তাকিয়ে আঙুল তুলে বললেন :]

মহামায়া। কী রে?

অরুণ (এক ঝটকায় মুখ ফিরিয়ে)। এখানে আর না। চললুম।

মহামায়া। তোর ইচ্ছে। আমি তোকে বেঁধে রাখবো না।

অরুণ (রাগে গজগজ করতে-করতে)। ওঃ, আমাকে পোষ মানাবেন ফেমাস মা-মহামায়া! আমি একটা বুনো জানোয়ার কিনা!

মহামায়া। সাবধান, অরুণ, সাবধান। আমি কিন্তু বশীকরণ মন্ত্র জানি।

অরুণ। তা আর জানো না! আমার মা-র মতো আরো কতগুলোকে ভেড়া বানিয়েছো, শুনি? মনে করেছো কিছুই টের পাইনি? ঐ টাকাগুলো দেখে এমন ভাব করলে যেন টাকা কাকে বলে তাই তুমি জানো না! ভড়ংও জানো!

মহামায়া। কিছু-কিছু ভড়ং না-করলে কি আর মানুষের মন পাওয়া যায়!

অরুণ। কিন্তু ঐ সব টাকা তুমি আমাকে ঠকিয়ে নিচ্ছো, তা জানো? মা-র আবার টাকা কী? সবই বাবার টাকা। আর বাবার টাকা মানেই—আমার টাকা। বাবা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন, এদিকে মা যে তলে-তলে তাঁর সর্বনাশ করছেন, তা জেনে-শুনেও তো দিব্যি চুপ ক'রে আছেন! বাবাঃ, এমন স্ত্রৈণ পুরুষ আর দেখিনি!

মহামায়া। তোর মতো কুপুত্র হ'লে এমনি হয়! শুনলি তো, তোর বাবা তোর নামে কাগজে-কাগজে কী সব লিখে পর্যন্ত দেবেন! কত কষ্টে পিতা পুত্রের নামে ও-রকম লিখতে পারে তা তো বুঝিস। নাকি তাও বুঝিস না?

অরুণ। ভারি তো! ব'য়ে গেছে আমার! টাকা আমি ঢের রোজগার করতে পারবো। বাবার চোখ-রাঙানোকে আমি পরোয়া করি কিনা! (কথাটা অরুণ খুব তেজস্বী স্বরে বলবার চেষ্টা করলো, কিন্তু ঠিক সুরটি যেন লাগলো না।)

মহামায়া। আমি তো মনে করি তোর এখন বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভালো। তোর যদি মত হয় আমিই যেতে পারি তোকে নিয়ে।

অরুণ। ও, বাবাকে তাঁর পুত্ররত্ন ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর মনটিও কিঞ্চিৎ গলাবে বুঝি? তুমি ভেবেছো তোমার চালাকি আমি বুঝিনি?

মহামায়া। তোর কাছে ধরা প'ড়ে গেছি। আমার ছলা-কলা কিছুই আর খাটলো না।

অরুণ (খুশি হয়ে)। হ্যাঁ, তাই বলো! সত্যি কথাটা কবুল করো তাহ'লে। ব্যবসাটা বেশ জমিয়েছো কিন্তু।

মহামায়া। সে তো দেখতেই পাচ্ছিস।

অরুণ। বেশ কথা। এখন তাহ'লে শোনো। আমার মা তোমার পায়ে এ পর্যন্ত যত টাকা ঢেলেছেন সব যদি আমাকে ফিরিয়ে দাও তাহ'লে আমিও মা-মহামায়ার জয়ধ্বনি করতে-করতে এখান থেকে বেরিয়ে যাবো, আর যদি না দাও তাহ'লে তোমার স—ব কথা ফাঁস ক'রে দেবো—যাদবপুরে ব'সে অবতারগিরি ফলানো আর চলবে না।

মহামায়া। তোর যা ইচ্ছে তা-ই করিস।

অরুণ। তাহ'লে টাকা আমাকে দেবে না?

মহামায়া। টাকা? টাকা আমি পাবো কোথায়? এখানে থাকিস যদি, খেতে-টেতে দিতে পারি, তার বেশি কিছু পারি না।

অরুণ। আদ্ধেকও দেবে না? আচ্ছা, আদ্ধেকেই আপোশ করো, তাতেই রাজি।

মহামায়া। আমার টাকা থাকলে তোকে সবই দিতুম, কিন্তু আমার যে কিছুই নেই।

অরুণ। আহা—তোমার না আছে তোমার ঐ বোম-ভোলা স্বামীর তো আছে।

মহামায়া। আমার তো স্বামী নেই।

অরুণ। ও, তোমার স্বামীও নেই! তাহ'লে তুমি···(অরুণের মুখে একটা কুৎসিত কথা আসছিলো, সেটা চাপতে গিয়ে ঠোঁটটা হাসিতে বেঁকে গেলো!)

মহামায়া। হাসছিস যে?

অরুণ। না ··· ভাবছিলুম, তুমি দেখতে ভারি সুন্দর কিন্তু।

মহামায়া। হ্যাঁ, ঐটুকুর জোরেই তো ব্যবসা চালাচ্ছিলুম। কিন্তু এবারে তুই তো সব ফাঁস করে দিবি, তারপর কী উপায় হবে জানিনে। ভাবনা হচ্ছে।

অরুণ। তাহ'লে দেবে না টাকা?

মহামায়া। আর কোনো কথা আছে তোর? আমার আর বেশি সময় নেই।

অরুণ। ও, মা-মহামায়া এখন বুঝি ভক্তদের দর্শন দেবেন?

মহামায়া। আমাকে একটুখানি চোখে দেখে এতগুলো লোক যদি খুশি হয়, সে কি আমার দোষ? কেন যে ওরা আমাকে এত ভালোবাসে বলতে পারিস? আমার ভিতরে যে সবই ফাঁকি, আসলে আমি যে অতি সাধারণ একজন মানুষ তা তোর চোখে তো ধরা পড়লো! তোর মতো বুদ্ধিমান ওদের মধ্যে একজনও কি নেই?

অরুণ। ভালো হবে না ব'লে দিচ্ছি! আমাকে নিয়ে ঠাট্টা!

মহামায়া। না, না, ঠাট্টা কিসের! সবাই মিথ্যে আমাকে পুজো করে, তুই সত্যি আমাকে দেখতে পেয়েছিস। তাহ'লে এখনি যাচ্ছিস?

অরুণ। হ্যাঁ, এক্ষুনি যাবো।

মহামায়া। বাড়ি ফিরে যাবিনে?

অরুণ। রক্ষে করো! বাড়ি ফিরলেই তো পিতৃদেবের হুঙ্কার আর ঐ উজ্জ্বলার ফোঁশফোঁশানি। ভেবেছিলুম তোমার এখানে দুটো দিন

একটু শান্তিতে থাকতে পারবো—তা এখানেও উজ্জলা! ওর ভেউ-ভেউ রোগ আর সারলো না! উঃ, সহ্য হয় না এই মেয়েলি নাকি কান্না!

মহামায়া। ওর চোখের জলেও তোর মন ভিজলো না, অরুণ! তুই কি মানুষ? এই যে বাড়ি ছেড়ে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছিস, ওদের কথা একবারও মনে পড়ে না তোর?

অরুণ। মনে পড়ে বইকি। (পকেট থেকে একটা চকচকে জিনিশ বের ক'রে)। এটা দেখলেই মনে পড়ে।

মহামায়া। কী ওটা?

অরুণ। মোহর। খাঁটি সোনার মোহর।

মহামায়া। খুব বড়োলোক হয়েছিস তো। কোথায় পেলি? বৌয়ের বাক্স ভেঙেছিস বুঝি?

অরুণ। বোধ হয়। নয়তো কোথায় পাবো এ-সব? সেদিন দেখি ভিতরের পকেটে এইটি র'য়ে গেছে। আগে যদি জানতুম—

মহামায়া। আগে জানলে কি আর তোমার এই মায়া-মালঞ্চে আসি—এই তো? তা ওটাও যখন খরচ হ'য়ে যেতো, তখন?

অরুণ। আহা—আমি যে ভক্তি-সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে-খেতে তোমার ঘাটে এসে ভিড়িনি, তা তো বোঝোই। হাতের রেস্ত ফুরিয়ে গেলো, শরীরেও আর দিচ্ছিলো না—হঠাৎ মনে হ'লো, মা-মহামায়ার আস্তানায় গিয়ে উঠলে তো মন্দ হয় না। আর যাই হোক, পাওনাদারের বাবার সাধ্যি নেই ওখানে আমাকে খুঁজে বের করতে পারে।

মহামায়া। ছোটো-ছোটো পাওনাদারের হাত এড়াতে গিয়ে মস্ত বড়ো পাওনাদারের হাতে এসে পড়লি, অরুণ।

অরুণ। ঠিক বলেছো কথাটা! তুমি যে একজন কত বড়ো পাওনাদার তা তো চোখেই দেখলুম। তফাৎ শুধু এই যে অন্য পাওনাদারগুলোর মুখ দেখলেই পিত্তি জ্ব'লে যায়, আর তোমাকে দেখলেই

মনটা কেমন নরম হ'য়ে আসে। তোমার পক্ষে সেটা কত বড়ো সুবিধে ভেবে দ্যাখো।

মহামায়া (অবিচলিত)। আমাদের সমস্ত জীবনের যিনি পরম পাওনাদার, তাঁকে কি তুই ফাঁকি দিতে পারবি ভেবেছিস?

অরুণ (মহামায়ার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে)। বাজে কথাগুলো বেশ মনোরম ক'রে বলবার বিদ্যেটা খুব জানা আছে তো তোমার! কিন্তু তোমার মুখের ভালো-ভালো বাণী শুনে আমার তো বেশিদিন চলবে না—আমি এবার নিজের পথ দেখি।

মহামায়া। এখান থেকে যাওয়া তোর হবে না।

অরুণ। তুমি ভাবছো দায়ে প'ড়েই তোমার এখানে প'ড়ে থাকবো? তা আর হচ্ছে না। (মোহরটি হাতের তেলোয় নাচাতে লাগলো।)

মহামায়া। আমাকে দে ওটা।

অরুণ। তোমাকে দেবো কেন?

মহামায়া। এই যে এই ক'দিন তোকে খাওয়ালুম, নতুন জামা-কাপড় কিনে দিলুম, তার দাম না-দিয়েই যাবি? তোর একটা আত্ম-সম্মান নেই?

অরুণ (মুচকি হেসে)। তুমি হ'লে গিয়ে মা-মহামায়া, সাক্ষাৎ রাধা-পার্বতীর মিলিত অবতার, কত সব বড়ো বড়ো লোক তোমার চরণে কত টাকাই ঢালছেন—তোমার ঋণ কি এত সহজেই শোধ হয়?

মহামায়া। তা যদি বুঝিসই, তবে যা করলে শোধ হয় তা-ই কর।

অরুণ (মহামায়ার মধুর ভঙ্গি মনে-মনে উপভোগ ক'রে)। কী করতে হবে?

মহামায়া। এখানে থাকতে হবে। আমার কথামতো চলতে হবে।

অরুণ (একটু চুপ ক'রে থেকে)। বেশ, তা-ই হবে। তোমার এই জায়গাটা তো মন্দ নয়, কিন্তু রোজ সন্ধেবেলায় এত গোলমাল—

মহামায়া। গোলমাল কী রে! কেত্তন। শুনলে মন পবিত্র হয়।

অরুণ (মহামায়ার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে)। তোমাকে দেখে মনটা পবিত্র হচ্ছে বটে।...আচ্ছা নাও, মোহরটা তোমাকেই দিয়ে দিলুম! এই এখন আমার শেষ সম্বল। তা কী আর হবে—নাও, তুমিই নাও। (একটু চুপ ক'রে থেকে) যাকে দেখলেই সর্বস্ব দিতে ইচ্ছে করে এমন মানুষের দেখা তো আর রোজ পাওয়া যায় না।

মহামায়া। তোর সর্বস্ব দিলি আমাকে? মনে থাকে যেন।—তাহ'লে যা এখন, ঘরে গিয়ে চুপচাপ ব'সে থাক। আমি আর দেরি করতে পারছি না। মনে রাখিস, ঘর ছেড়ে কোথাও বেরোবি না।

অরুণ। একেবারে জেলখানা!

মহামায়া। তা মন্দ কী! আজ থেকে তুই আমার বন্দী।

অরুণ। তোমার বন্দী! (হাসলো)

মহামায়া (চ'লে যেতে-যেতে হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়ে)। তোকে দেখে-দেখে কী মনে হয়, জানিস? মনে হয় পূর্বজন্মে তুই আমার সখা ছিলি।

[অপরূপ একটু হেসে মহামায়া অন্তর্হিত হ'লেন। অরুণ চুপ ক'রে একটু দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরে মহাদেব সেখানে এলেন]

অরুণ। এই এলেন বোম-ভোলানাথ! কী সংবাদ?

মহাদেব (ভাঙা-ভাঙা মোটা গলায়)। ঘরে যাও।

অরুণ। ওরে বাবা, এ যে দেখছি সত্যিই জেলখানা। কেটে পড়লেই ভালো করতুম।

মহাদেব। মা যা ইচ্ছা করেন তা-ই হয়। আমরা তো তাঁর হাতের পুতুল। তোমার কি কোনো ক্লেশ হচ্ছে?

অরুণ। না, ক্লেশ আর কী।

মহাদেব। যখন যা প্রয়োজন আমাকে বোলো।

অরুণ। তাহ'লে মনের কথাটা খুলেই বলি। ছাখো বাবা, চেহারাখানা যা বাগিয়েছো, দেখে তো সিদ্ধপুরুষই মনে হয়।···(গলা নামিয়ে) মাল-টাল কিছু আছে?

মহাদেব (জিভ কেটে)। আরে ছি-ছি!

অরুণ। আরে ছি-ছি, আমার কাজে আর লজ্জা কী। কিছু থাকে তো দাও, বাবা, একটি ফোঁটা পেটে না-পড়লে প্রাণ তো আর বাঁচে না।···বিলিতি না হোক, দিশি?

মহাদেব। জীবের মধ্যেই শিবের বাসা, তাঁকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। তুমি ঘরে যাও, আমি এক্ষুনি আসছি। কিন্তু দেখো বাবা, মা যেন টের না পান।

অরুণ। তিনি কি তোমারও মা নাকি?

মহাদেব (ঊর্দ্ধনেত্র হ'য়ে)। বিশ্বের জননী তিনি!

যবনিকা

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কয়েক দিন পরে অরিন্দমের ড্রয়িংরুমে বিকেলবেলা। লম্বা সোফায় পা তুলে ব'সে বুলি একটি মোটা ছবির বই দেখছে। বসেছে এলানো ভঙ্গিতে, পিঠের নিচে একটি কুশান, আলতা-পরা পা দুটি রেখেছে মিশকালো কুশানের উপর। অবিন্যস্ত অবস্থা আর নেই। সুন্দর শাড়িটি পরেছে সুন্দর ক'রে, অভিনব ভঙ্গিতে চুল বাঁধা। পায়ের নখগুলো এই বাঁকাচ্ছে এই খুলছে—সেখানেও ঈষৎ লাল রং।

নিরঞ্জন আস্তে-আস্তে ঘরে এসে ঢুকলো। বুলি প্রথমে তাকে লক্ষ্য করলে না। নিরঞ্জন এগিয়ে তার পায়ের কাছে এসে চুপ ক'রে দাঁড়ালো। হঠাৎ বই থেকে চোখ তুলে নিরঞ্জনকে দেখতে পেয়েই বুলি পা নামিয়ে সোজা হ'য়ে বসতে-বসতে বললে :]

বুলি। আপনি ! আসুন !

নিরঞ্জন (একটু হাসলো, কিছু বললে না)।

বুলি (বই রেখে দাঁড়িয়ে)। এই ছবির বইটা দেখছিলাম—তাই আপনি যে ঘরে এলেন তা দেখতে পাইনি।

নিরঞ্জন। আমিও একটি ছবি দেখছিলুম—খুব সুন্দর ছবি—তাই তোমাকে ডাকিনি।

বুলি (লাল হ'য়ে উঠে)। বসুন। কতদিন পর এলেন! ভাবছিলুম আপনাকে একটা—(হঠাৎ থেমে গেলো)।

নিরঞ্জন। কী বলছিলে ?

বুলি। এই ভাবছিলুম—অনেক দিন আসেন না—কোনো অসুখ-টসুখ করলো না তো ?

নিরঞ্জন। অসুখ করলেও তো খবর নিতে না।

বুলি। কেমন ক'রে নেবো ? এই শহরে আপনি কোথায় থাকেন তা কি আমি জানি ?

নিরঞ্জন। তুমি না জানো, অরুণ তো—(হঠাৎ থেমে গেলো)।

বুলি। (একটু চুপ ক'রে থেকে)। আপনি বোধ হয় জানেন না দাদার সঙ্গে আমাদের দেখাশোনা খুব কম হয় ?

নিরঞ্জন (শুষ্কস্বরে)। তাই নাকি ?

বুলি। আজও কি আপনি দাদার খোঁজেই এসেছেন ?

নিরঞ্জন (কয়েকবার কেশে)। আজকের কাগজে একটা—একটা ইয়ে দেখলুম—

বুলি। ঠিকই দেখেছেন। ও-বিজ্ঞাপন বাবাই দিয়েছেন।

নিরঞ্জন (তার মুখ শুকিয়ে গেলো কিন্তু সে-ভাবটা গোপন করবার যথাসম্ভব চেষ্টা ক'রে)। হঠাৎ—হঠাৎ এ-রকম ...।

বুলি। সে অনেক কথা।

নিরঞ্জন—ও।

[একটু চুপচাপ]

নিরঞ্জন (কিছু একটা বলবার জন্যই)। অরুণের ছেলে কেমন আছে ?

বুলি। ভালো না। খুব সম্ভব বাঁচবে না।

নিরঞ্জন। ও। (আর কী বলবে ভেবে পেলো না।)

বুলি। আপনার কাছে এখন আর কিছু লুকিয়ে লাভ নেই। সেই যেদিন আপনি প্রথম এলেন না, সেই রাত থেকেই দাদা ফেরার।

নিরঞ্জন (ঢোঁক গিলে)। মানে, ও বাড়িতেই থাকে না ?

বুলি। না। কোথায় থাকে তাও আমরা জানিনে।

[একটু চুপচাপ]

নিরঞ্জন (অন্যমনস্কভাবে)। আচ্ছা, আজ চলি।

বুলি। এখুনি যাবেন ?

নিরঞ্জন। বাড়ির আর-সব লোক কোথায় ?

বুলি। আর-সব মানে তো মিনি? বলাই বাহুল্য, মিনি মায়া-মন্দিরে। কী আর করবেন, একদিন না-হয় আমার সঙ্গেই গল্প করলেন।

নিরঞ্জন। এখানে এসে তোমার সঙ্গেই তো গল্প করি।

বুলি। কিন্তু আমার সঙ্গে গল্প করার জন্যই তো আর আসেন না।

নিরঞ্জন। কী ক'রে জানো?

বুলি। আপনি কি ভাবেন মানুষের মনের কথা আমি কিছুই বুঝিনে?

নিরঞ্জন। বোঝো না কি?

বুলি। প্রমাণ চান? তাহ'লে এক্ষুনি একটা প্রমাণ দিচ্ছি। সত্যি ক'রে বলুন তো, দাদাকে আপনি কত টাকা ধার দিয়েছেন?

নিরঞ্জন (লাল হ'য়ে)। তুমি বলছো কী, বুলি!

বুলি। বলুন না আমাকে—আমি বাবাকে ব'লে—

নিরঞ্জন। না, না—সে তেমন-কিছু নয়—নিশ্চয়ই ওর খুব বেশি-রকম দরকার ছিলো—তবে কিনা—আপিশের টাকাটা (নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনের কথাটা বেরিয়ে যাওয়ায় অপ্রস্তুতভাবে চুপ ক'রে গেলো।)

বুলি। এর জন্য আপনি এত লজ্জিত হচ্ছেন কেন? আপনি যা দিয়েছেন সব ফেরৎ পাবেন। আমি বাবাকে বলবো, তাহ'লেই হবে।

নিরঞ্জন। না, না, তোমার বাবাকে কক্ষনো কিছু বলতে পারবে না। তাহ'লে আমি লজ্জায় ম'রে যাবো।

বুলি। বাঃ, তাই ব'লে আপনার বুঝি লোকশান হবে!

নিরঞ্জন। ও একরকম হয়ে যাবে। কেউ যদি আমার পকেট মেরে দিতো তাহ'লেই বা কী করতাম। তাছাড়া, তোমার বাবা তো জানিয়েই দিয়েছেন যে অরুণের কোনো দেনার জন্য—

বুলি। আপনার বেলায় তার না-হয় ব্যতিক্রমই হ'লো। তা কি হ'তে পারে না ?

নিরঞ্জন। কেন হবে ?

বুলি। আপনি আমাদের বন্ধু, তাই হবে।

[একটু চুপচাপ]

বুলি। আপনি আর কদ্দিন আছেন কলকাতায় ?

নিরঞ্জন। কালকে যাবো ভাবছি।

বুলি। কালই! (তার গলা কেঁপে গেলো) এই না আপনার এক মাস ছুটি!

নিরঞ্জন। হ্যাঁ, ছুটি আরো হাতে আছে, তাই ভাবছি একবার ঢাকা ঘুরে আসি।

বুলি। ঢাকা কেন ?

নিরঞ্জন। এই—আত্মীয়-টাত্মীয় আছেন।

বুলি। কবে ফিরবেন ?

নিরঞ্জন। তা তো ঠিক করিনি। জাহাজ ছাড়বে একুশে, তার আগে ফিরলেই হয়।

বুলি। কবে যাবেন তাও বোধ হয় ঠিক করেন নি ?

নিরঞ্জন (হেসে)। সত্যি, যাবার কথা ভেবে-ভেবেই এ-ক'টা দিন কাটলো। এবার যা হোক মন স্থির করতেই হবে। কালই যাবো।

বুলি (গম্ভীর ভাবে)। কাল আপনার যাওয়া হবে না।

নিরঞ্জন। কেন ?

বুলি। আমি বারণ করছি।

নিরঞ্জন। তুমি বারণ করছো ?

বুলি (হেসে ফেলে)। কাল না-হয় নাই গেলেন।...তাহ'লে এই ঠিক হ'লো যে আপনি আর কোথাও যাবেন না, কলকাতাতেই ছুটিটা কাটাবেন ?

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিরঞ্জন। এ-কথা আমি কখন বললুম?

বুলি। মনে ক'রে নিন আমিই বললুম আপনার হ'য়ে। (যেন ভিতরের কোনো লজ্জা ঢাকবার জন্য—তাড়াতাড়ি) আচ্ছা, আপনি ছবি আঁকতে পারেন?

নিরঞ্জন। জ্যামিতির চিত্র অতি উত্তম আঁকতে পারি।

বুলি (লম্বা সোফায় ব'সে ছবির বইটা হাতে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া ক'রে)। যামিনী রায়ের ছবি আপনার কেমন লাগে?

নিরঞ্জন। ছবি-টবি আমি বিশেষ দেখিনি।

বুলি। দেখবেন? এখানে এসে বসুন না। (হাত দিয়ে নিজের পাশের জায়গা দেখিয়ে দিলে।)

[নিরঞ্জন উঠে এসে বুলির পাশে বসলো। তাদের মাঝখানে মোটা বইটি খোলা, দুজনে ঝুঁকে প'ড়ে দেখছে ব'লে মাথা দুটি অত্যন্ত কাছাকাছি।

হঠাৎ মিনি ঘরে এসে ঢুকলো। ওদের দু'জনকে দেখা মাত্র চোখ জ্ব'লে উঠলো অর। ঠোঁট বেঁকে গেলো। ওরা তাকে দেখতেই পেলে না। এ-ছবিটা যথেষ্ট দেখা হয়েছে মনে ক'রে বুলি যেই পাতা উলটিয়েছে, সঙ্গে-সঙ্গে মিনি ব'লে উঠলো।]

মিনি। এই যে নিরঞ্জনবাবু, কখন এলেন?

নিরঞ্জন (চমকে চোখ তুলে তাকিয়ে মিনিকে দেখেই ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো)।

বুলি। আজ এত শিগগির ফিরলি তুই?

মিনি। ফিরলুম মানে? আমি তো বাড়িতেই ছিলুম।

বুলি। তোকে না দেখলুম মা-র সঙ্গে বেরিয়ে যেতে?

মিনি। না, আমি তো যাইনি।

বুলি। মায়া-মালঞ্চে না-গিয়ে তোর দিন কাটে?

দ্বিতীয় অঙ্ক

মিনি। আজ মা-মহামায়াই আসবেন আমাদের বাড়িতে। একটু পরেই এসে পড়বেন।

বুলি। তাঁরই অভ্যর্থনার আয়োজন নিয়ে তুই বুঝি ব্যস্ত?

নিরঞ্জন (উঠে দাঁড়িয়ে)। আমি চলি তাহ'লে।

মিনি। এক্ষুনি যাবেন?

নিরঞ্জন। আমি অনেকক্ষণ এসেছি।

মিনি। বুলি আশা করি আতিথেয়তার ত্রুটি করেনি?

নিরঞ্জন (হেসে)। না, ও আজকাল ভদ্রতা-টদ্রতা সব শিখেছে।

মিনি। হ্যাঁ—বুলি আর সে-বুলি নেই!

নিরঞ্জন। সত্যিই তা-ই।

মিনি। আমি এসে প'ড়ে আপনাদের ব্যাঘাত করলুম মনে হচ্ছে?

নিরঞ্জন। আমার কত ভাগ্য আজও আপনার দেখা পেয়েছি!

মিনি। যা তো বুলি, এক দৌড়ে চায়ের কথা ব'লে আয় তো।

বুলি। নিরঞ্জনবাবু, আমি এক্ষুনি আসছি। (দ্রুত বেরিয়ে গেলো)

মিনি (দ্রুত মৃদুস্বরে)। আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?

নিরঞ্জন। আমি আপনার উপর রাগ করতে পারি আমার কি এতই যোগ্যতা?

মিনি। সেদিন আপনাকে অযথা কতগুলো কথা বলেছিলুম। নিজের মন ভালো ছিলো না, মেজাজ ঝাড়লুম আপনার উপর। আমারই অন্যায় হয়েছে।

নিরঞ্জন (চুপ)।

মিনি। আশা করি আপনি ও-সব কিছু মনে রাখেননি?

নিরঞ্জন। না, আমি কিছুই মনে রাখিনি। (চ'লে যেতে লাগলো)

মিনি। একেবারেই কিছুই মনে রাখেননি?

নিরঞ্জন (চুপ)।

মিনি (ব্যাকুলস্বরে)। চা খেয়ে যাবেন না?

নিরঞ্জন। অনেক ধন্যবাদ—আজ আর সময় নেই। (চ'লে গেলো)

মিনি (নিরঞ্জনের চ'লে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে)। সময় নেই! সময় নেই! এতক্ষণ তো বেশ সময় ছিলো।... আচ্ছা। (উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে-করতে) কী হ'লো? এ কী হ'লো আমার।...বুলি, বুলি।

বুলি (প্রবেশ ক'রে)। আমাকে ডাকছিলি? চা এক্ষুনি দিচ্ছে।... নিরঞ্জনবাবু কোথায়?

মিনি (কথা না-ব'লে হাতের ভঙ্গিতে জানালো যে নিরঞ্জন চ'লে গেছে)।

বুলি। চ'লে গেছে? চা না-খেয়েই চ'লে গেলো? আমাকে একবার ব'লেও গেলো না?

মিনি (জ্ব'লে উঠে)। তোর কাছে ঘটা ক'রে বিদায় না-নিয়ে এ-বাড়ি থেকে কেউ বুঝি যেতেও পারবে না? (বাইরের দিকে তাকিয়ে) ঐ যে! মা বুঝি এলেন! (বেগে বেরিয়ে গেলো)

[বুলি বিষণ্ণভাবে একটা চেয়ারে ব'সে পড়লো। বাঁ হাতের কড়ে আঙুল মুখের কাছে এনেও নামিয়ে নিলে—সে প্রতিজ্ঞা করেছে আর নখ কামড়াবে না। অশান্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে একটা বই-টই কিছু টেনে নিতে যাচ্ছে এমন সময় অরিন্দম এসে ঢুকলেন। তাঁর পরনে গাঢ় সবুজ রঙের সিল্কের লুঙ্গি, গায়ে শুভ্র সূক্ষ্ম আদ্দির লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি, মুখে সিগারেট।]

অরিন্দম। একা-একা এখানে ব'সে কী করছিস, বুলি? উপরে হুলুস্থুল কাণ্ড—মহামায়া সশরীরে উপস্থিত।

বুলি (ম্লান হেসে)। আমারও তোমার অবস্থা, বাবা।

অরিন্দম। একটু আগে না নিরঞ্জনের গলার আওয়াজ শুনলুম?

বুলি। হ্যাঁ—এসেছিলেন একটু আগে।

অরিন্দম। এত শিগগির চ'লে গেলো। আজকাল ভারি একা-একা লাগে তোর, না রে?

বুলি। কই, না তো।

অরিন্দম। বুলি, তুইও যে মন জুগিয়ে কথা বলতে শিখলি! উপায় হবে কী?

বুলি (একটু পরে)। এবার আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে তো, বাবা?

অরিন্দম। সত্যি যাবি তুই?

বুলি। বেশি যেন ইচ্ছে নেই তোমার?

অরিন্দম। একা কি থাকতে পারবি ওখানে?

বুলি। একা আর কোথায়? তুমিই তো আছো। তাছাড়া তুমিও তো একাই থাকো। আমি গেলে তবু দেখাশোনা করবার একটা লোক হবে।

অরিন্দম (হেসে উঠে)। সে-কথা সত্যি। কিন্তু আমি ভাবছিলুম নাগপুর গিয়ে আর কী করবি, তোর যাবার মতো একটা চমৎকার জায়গায়ই তো রয়েছে।

বুলি। কোথায় সেটা?

অরিন্দম। শ্বশুরবাড়ি।

বুলি (হেসে উঠে)। ভুল বললে, বাবা। আজকালকার মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি যায় না, স্বামীর বাড়ি যায়।

অরিন্দম। ঠিক বলেছিস। সত্যি ভাবছি এবার তোর বিয়ে দেবো।

বুলি। আর-একটা ভুল হ'লো। আজকালকার মেয়েদের বিয়ে হয় না, তারা বিয়ে করে।

অরিন্দম। সেটাই তো চাই। একটা কথা তোকে ব'লে রাখি, বুলি। যদি কখনো প্রেমে পড়িস আমাকে বলিস কিন্তু।

[হৈমন্তী ছুটে এসে ঢুকলেন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

হৈমন্তী (হাঁপাতে-হাঁপাতে)। তিনি আসছেন! একটু বুঝে-সুঝে কথাবার্তা বোলো কিন্তু।

[মহামায়া ধীরপদে ঘরে এলেন, বুলি অলক্ষিতে বেরিয়ে গেলো।]

অরিন্দম (হাত তুলে নমস্কার ক'রে)। কেমন আছেন?

মহামায়া। আপনাকে একটা সুখবর দিতে এলুম। আপনার ছেলে বাড়ি ফিরে এসেছে।

অরিন্দম (হঠাৎ চমকে)। ও, তাই নাকি?

মহামায়া। ঐ পাশের ঘরে আছে—লজ্জায় আপনার কাছে আসতে পারছে না।

অরিন্দম। আশ্চর্য! তা'হলে ওর লজ্জাও আছে!

মহামায়া। আপনি বোধ হয় জানেন না যে আমিই ওকে ফিরিয়ে আনলুম?

অরিন্দম (মজলিশি ধরনে)। সত্যি?

মহামায়া। আজ সকালে ও হঠাৎ আমার ওখানে গিয়ে উপস্থিত—

অরিন্দম। বলেন কী! তবে কি ওর ধর্মে মতি হ'লো? (হেসে উঠলেন। হৈমন্তী তীব্র দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকালেন, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে চোখোচোখি করতে পারলেন না।)

মহামায়া। আমি ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে—

অরিন্দম (কথা কেড়ে নিয়ে)।—একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন। অনেক ধন্যবাদ।

মহামায়া (একটু হেসে)। ওর যত দোষই থাক, আপনাকে ও মনে-মনে ভালোবাসে।

অরিন্দম। কী ক'রে বুঝলেন?

মহামায়া। বোঝা যায়। মা-র চেয়ে বাপের উপরেই ওর বেশি টান।

অরিন্দম। হ্যাঁ, বাপের টাকার প্রতি ওর প্রবল আকর্ষণ আমিও লক্ষ্য করেছি। (হেসে উঠলেন)

মহামায়া (তীক্ষ্ণ ঠাণ্ডা চোখে অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে)। পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলেই ধনীপুত্র হ'য়ে জন্মানো যায়। পুত্র যে পিতার বিত্ত ভোগ করে সেটা তার পুণ্যেরই উপার্জন।

অরিন্দম। আমাকে রীতিমতো লজ্জা দিচ্ছেন! হাতে যা এসেছে সব উড়িয়ে দিয়েছি—কিছুই রাখতে পারিনি।

মহামায়া। দু'হাতে খুব খরচ করেন—না?

অরিন্দম (বেশ একটু ফুর্তির সুরে)। এক হাতে খরচ করলে আর-এক হাতে পৌঁছয় না যে।

মহামায়া (তাঁর ঠাণ্ডা চোখ একটু চকচক ক'রে উঠলো—খুব নিচু নরম গলায়)। হ্যাঁ, দু'হাতে যে ঢালে সেই আবার দু'হাত ভ'রে পায়।—অরুণেরও আপনার ধাত।

অরিন্দম। কোন হিশেবে বলছেন?

মহামায়া। ওরও বেহিশেবি ঝোঁক।

অরিন্দম। একবার দেখেই খুব চিনেছেন তো ওকে। না কি ওর সঙ্গে আপনার আজকেই প্রথম দেখা নয়?

মহামায়া (দু'তিন সেকেণ্ড চুপ ক'রে থেকে, একটু হেসে)। বাঃ, ওকে তো কবেই দেখেছি। (উঠে দাঁড়ালেন)

অরিন্দম (সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে)। সে কী! এখনই যাচ্ছেন? কিছুই আপ্যায়ন করা হ'লো না—একটু মিষ্টি-টিষ্টি—

মহামায়া (মধুর হেসে)। আমি দিনে একবারই খাই।

অরিন্দম। তাহ'লে যাবেনই? অপরাধ নেবেন না—অনেক বাজে বকলুম। নমস্কার।

[মহামায়া ও হৈমন্তী বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে ঝড়ের বেগে হৈমন্তীর পুনঃপ্রবেশ।]

হৈমন্তী। কার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বললে সে-খেয়াল আছে?

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরিন্দম (তাঁর ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি ফুটলো)।

হৈমন্তী। নিজেকে তুমি মনে করো কী? এঁর পায়ের ধুলো বাড়িতে পড়লে কত রাজা-মহারাজা ধন্য হ'য়ে যায়, জানো? ইনি যে কত বড়ো তা তুমি কী বুঝবে? না বোঝো চুপ ক'রে থাকো। এ-সব এয়ার্কি করতে কে বলেছে তোমাকে?

অরিন্দম। সত্যি, ইনি কথাবার্তা বলতে জানেন। আমার তো বেশ ভালোই লাগছিলো।

হৈমন্তী। অনেক সৌভাগ্য তোমার, ওঁর মতো মানুষ তোমার সঙ্গে যেচে কথা বলেছেন। উনি অত্যন্তই মহৎ, তাই তোমার সমস্ত বর্বরতা ক্ষমা করলেন।

অরিন্দম (চোখ গোল-গোল ক'রে)। বলো কী! আমার তো আরো মনে হ'লো তিনি আমাকে বেশ পছন্দই করলেন। তিনি কি রাগ করেছেন? আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি? (অরিন্দমের কণ্ঠস্বরে রীতিমতো উদ্বেগ ফুটে উঠলো।)

হৈমন্তী। তোমাকে তিনি আজ কতখানি কৃপা করলেন তা যদি বুঝতে তাহ'লে আর ও-রকম কথা বলতে না। জানো, টাটাকে দেখে তিনি কী বলেছেন? বলেছেন, কিছু ভয় নেই, ও মরবে না। ভাবতে পারো, ব'লে গেছেন এ-কথা! দৈব-শক্তির অধিকারী না-হ'লে কেউ পারে ও-রকম বলতে! এদিকে তোমার ডাক্তাররা তো—

অরিন্দম। পাগল! ডাক্তারের সঙ্গে ওঁর তুলনা! সত্যি তুখোড় মানুষ তোমাদের এই মা-টি। সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে কথা বলবার কী অসাধারণ ক্ষমতা! বাড়ি থেকে বেরিয়ে খোকা তাঁর আশ্রয়েই ছিলো বুঝি? তুমি জানো নাকি?

হৈমন্তী (কাঁপতে-কাঁপতে দাঁতে দাঁত চেপে সাপের মতো ফোঁশ ক'রে উঠে)। তোমার কথা শুনলে পাপ! তোমার মুখ দেখলে পাপ!

যবনিকা

তৃতীয় দৃশ্য

[দিন পনেরো পরে দুপুরবেলায় অরিন্দমের ড্রয়িংরুমে অরিন্দম একা ব'সে, হাঁটুর উপর রাইটিং প্যাড রেখে খুব মন দিয়ে কী লিখছেন। এ-ক'দিনে তাঁর চেহারা অনেকটা খারাপ হ'য়ে গেছে, যেন বুড়ো হ'য়ে গেছেন। পাশে ছাইদানে শোওয়ানো সিগারেট থেকে ধোঁয়া উঠছে।]

(নীরদ ডাক্তারের প্রবেশ)

অরিন্দম। এসো, এসো। (কাগজ-কলম রেখে দিয়ে সিগারেটটা তুলে নিলেন) এই অসময়ে কোত্থেকে ?

নীরদ (ব'সে)। কল সেরে বাড়ি ফিরছিলুম—ভাবলুম তোমাকে একবার দেখে যাই।

অরিন্দম। (চেয়ারে হেলান দিয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে)। কেমন দেখছো আমাকে ?

নীরদ। ভালো না। (একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে ব'সে) আমি বলি কী, মন থেকে ওটা মুছে ফ্যালো। যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। আমি তো তোমাকে বলেছি, ও বেঁচে থাকলেও—

অরিন্দম (হাত তুলে)। থাক, থাক, ও-কথা আর না।

নীরদ (একটু চুপ ক'রে থেকে)। বৌমার বড্ড লেগেছে, না ?

অরিন্দম। সান্ত্বনার্থে তাঁকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। হিন্দু রমণীর ঐ একটা জায়গা তবু আছে।

নীরদ। যাক, যা হবার তা তো হ'য়ে গেলো,—এখন ভবিষ্যৎকে বেঁধে ফেলা দরকার। তোমার ছেলে বাড়ি ফিরেছে শুনলুম, সে তো এখনো এলো না আমার কাছে।

অরিন্দম (ক্লান্তস্বরে)। আত্মহত্যা যে করবেই, তাকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'রে লাভ কী ?

নীরদ। অরিন্দম, এতটা হতাশ হ'য়ে পড়া কি ভালো ?

অরিন্দম। ভুল করছো, নীরদ। দুঃখটা অতি বাজে জিনিশ, মানুষের মন আবর্জনার মতোই সেটাকে ফেলতে-ফেলতে চলে। তুমি কি শুনে অবাক হবে যে আমার মনে এরই মধ্যে আবার নতুন আশার কুঁড়ি ধরেছে ?

নীরদ। না, এতে অবাক হবো কেন ? আশা করবার এখনো তা তোমার কতই আছে।

অরিন্দম। তুমি তো জানো সামনের বছরেই আমার চাকরির মেয়াদ ফুরোবে। তারপর আর কলকাতায় না। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে ছোটো একটি বাড়ি—শালবনের ছায়া—অফুরন্ত অবসর—মনে হচ্ছে জীবনের চরম সুখ এইটেই। তার আগে সংসারের দাবি সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিতে হবে। এই দ্যাখো না, তার সব ব্যবস্থা করছি। (যে-কাগজটা লিখছিলেন সেটি তুলে নিলেন।)

নীরদ। কী ওটা ?

অরিন্দম। আমার উইলের খসড়া।

নীরদ। উইল করছো ? ভালো। তোমার আমার বয়সে প্রস্তুত হ'য়ে থাকাই উচিত।

অরিন্দম (হেসে)। আরে না, না। সে-জন্য নয়, সে-জন্য নয়। আমার যে-রকম স্বাস্থ্য, আরো কুড়ি বছর অন্তত নিশ্চয়ই বাঁচবো, কী বলো ? জীবনের এখনই হয়েছে কী। মনে হচ্ছে, ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে আবার নতুন ক'রে বাঁচতে শুরু করবো। তারই জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

নীরদ। তোমার কথা শুনে হিংসে হচ্ছে হে। আমাদের এই রোগী-মারা পেশায় নিজে না-মরলে আর ছুটি নেই।

অরিন্দম (উইলের কাগজটা তুলে নিয়ে)। এই দ্যাখো আমার ছুটির পরওয়ানা। শোনো, আমার উইলের প্রথম সর্ত হচ্ছে যে আমার

পুত্র শ্রীমান অরুণকুমার সরকারকে আমি ত্যজ্যপুত্র করলুম—আমার সম্পত্তির একটি কপর্দকও সে পাবে না—

নীরদ (একটু ভেবে)। এটা কি ভালো হ'লো ?

অরিন্দম। ভালো হ'লো না ? খুব ভালো হ'লো ! যতদিন ওকে আমার ছেলে ব'লে ভাববো, ততদিন আমার ছুটি কোথায় ?

নীরদ। বুঝতে পারছি, তোমার মনের মধ্যে খুব একটা উত্তেজনা চলেছে। না-হয় আর দু' এক দিন ভেবে-চিন্তে—

অরিন্দম। না, না, এই উইল আজকের মধ্যেই পাকা ক'রে ফেলবো, তাহ'লেই একটা বাঁধন আমার খ'সে যায়। তারপর মেয়ে দুটোর বিয়ে হ'য়ে গেলেই আমি একেবারে মুক্ত পুরুষ। তারও আর বেশি দেরি করা চলবে না।

নীরদ। পাত্রের সন্ধান পেয়েছো নাকি ?

অরিন্দম। আমার তো ইচ্ছে ছিলো তোমার ছেলের সঙ্গেই—

নীরদ। আরে আমারও তো মনে-মনে তা-ই ইচ্ছে। সেদিন কথায়-কথায় ছেলের কাছে কথাটা পেড়েছিলুম। ভেবেছিলুম ফোঁশ ক'রে উঠবে—তা বেশ একটা মাথা-চুলকোনো আমতা-আমতা গোছের ভাবই তো দেখলুম। লক্ষণটা আশাপ্রদ। মিনি-মাকে দু'একবার বোধ হয় দেখেছে-টেকেছে—

অরিন্দম (উৎসাহিত হ'য়ে)। তাহ'লে আর কথা কী। এই শ্রাবণেই শুভ-কার্য হ'য়ে যাক। আমি না-হয় আরো মাসখানেক ছুটি বাড়িয়ে নিচ্ছি।

নীরদ। বেশ তো, বেশ তো, তাহ'লে তো খুব ভালোই হয়। আমি ছেলের সঙ্গে ভালো ক'রে কথাবার্তা ব'লে নিয়েই তোমাকে

জানাবো—জানোই তো ভাই, তার মতেই আমাদের চলতে হয়। ইতিমধ্যে যদি ছোটোটির পাত্র ঠিক করতে পারো তাহ'লে একসঙ্গেই দু'জনের—

অরিন্দম। ও, বুলি। তার বিয়ের জন্য আমার ভাবনা নেই।

নীরদ। ভাবনা নেই? কেন?

অরিন্দম। আচ্ছা আচ্ছা, মিনির আগে হোক তো, তারপর ওর কথা ভাবা যাবে।

নীরদ (উঠে দাঁড়িয়ে)। আচ্ছা, অনেক বেলা হ'লো। শিগগিরই আসবো আবার।

অরিন্দম (দাঁড়িয়ে)। না, না, আমিই যাবো তোমার ওখানে। আমি কন্যাপক্ষ, আমারই তো যাওয়া উচিত।

নীরদ। ও, তুমি কন্যাপক্ষ বুঝি? (হেসে উঠলেন)

[দু' বন্ধু হাসতে-হাসতে বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে ভিতরের দিক থেকে বুলি ঘরে এসে ঢুকলো। তার পরনে বেরোবার কাপড়-চোপড়। উঁচু হীলের জুতো; হাতে ছাতা, ব্যাগ। দৃপ্ত সতেজ তার চলবার ভঙ্গি। ঘর পার হ'য়ে সে হনহন ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছিলো, মিনি প্রায় ছুটে এসে পিছন থেকে তাকে ডাকলে:]

মিনি। বুলি।

বুলি (বাইরের দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে)। কী?

মিনি। কোথায় যাচ্ছিস?

বুলি। বেরুচ্ছি।

মিনি। কোথায়?

বুলি। যাচ্ছি সিনেমায়।

মিনি। একাই?

বুলি। হ্যাঁ, একাই যাচ্ছি।

মিনি। বাবাকে বলেছিস?

বুলি। তার জন্য তো তুই-ই আছিস। (যাবার জন্য পা বাড়ালো)

মিনি। (ছুটে এসে বুলির সামনে দাঁড়িয়ে)। একা-একা তোর যাওয়া হ'তে পারে না।

বুলি। কেন, আমাকে কেউ কি খেয়ে ফেলবে রাস্তায়?

মিনি। ভালো হচ্ছে না, বুলি! রোজ-রোজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় যাস তুই?

বুলি। বাড়িতে ভালো লাগে না—তাই ঘুরে বেড়াই।

মিনি। কাল কোথায় গিয়েছিলি?

বুলি। গিয়েছিলুম একটা ফোটোগ্রাফের এগজিবিশন দেখতে।

মিনি। আর পরশু?

বুলি। পরশু? উট্‌রাম ঘাটে একটা মানোয়ারি জাহাজ এসেছে, তা-ই দেখতে গিয়েছিলুম।

মিনি। আজ তোর যাওয়া হবে না।

বুলি। কী বলছিস?

মিনি। বলছি, আজ তোর যাওয়া হবে না। (বুলির হাত চেপে ধ'রে) তুই যেখানে যাস নিরঞ্জনও সেখানে যায়। যায় কিনা বল্!

[মিনির এমন কণ্ঠস্বর বুলি জীবনে শোনেনি। তার বুক কেঁপে উঠলো।]

মিনি। বল্, নিরঞ্জনও সেখানে যায় কিনা।

বুলি। হাত ছাড়ো আমার।

মিনি। না—না—কিছুতে না—যেতে পারবিনে তুই।

বুলি। ছাড়ো বলছি! (এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বুলি বেরিয়ে গেলো।)

[মিনি আকুল হ'য়ে একটা চেয়ারের উপর লুটিয়ে পড়লো। একটু পরে বাইরের দরজা দিয়ে অরিন্দম ঢুকলেন।]

তৃতীয় দৃশ্য

অরিন্দম। মিনি! কী হয়েছে তোর?

মিনি (চোখ তুলে তাকিয়ে)। আমার কিছু হয়নি, কিন্তু তোমার ছোটো মেয়ের খবর কিছু রাখো?

অরিন্দম। বুলি? সে তো বেশ ভালোই আছে।

মিনি। এইমাত্র সে যে বেরিয়ে গেলো তা জানো?

অরিন্দম। হ্যাঁ, আমার সঙ্গে দেখা হ'লো তো।

মিনি। তুমি ওকে কিছু বললে না?

অরিন্দম। কী বলবো?

মিনি। তুমি বারণ করলে না?

অরিন্দম। কেন, বারণ করবো কেন?

মিনি। বুলি নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, উচ্ছন্নে যাচ্ছে—তুমি দেখেও কিছু দেখছো না!

অরিন্দম। তা-ই নাকি?

মিনি। জানো, ও রোজই এ-রকম বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়?

অরিন্দম। যায় নাকি? ওকে তো সব সময়ই বাড়ি ব'সে থাকতে দেখতুম।

মিনি। সেদিন আর নেই! যখন খুশি যায়—যখন খুশি ফেরে—

অরিন্দম। তা সব সময় বাড়ি ব'সে থাকা কি ভালো? এ-বাড়ির কেউই তো বাড়িতে থাকতে ভালোবাসে না, ওর আবার বাড়াবাড়ি ছিলো। মোটে বেরোবেই না!

মিনি। তাই ব'লে একা-একা যেখানে-সেখানে—

অরিন্দম। একা না-গিয়ে বেচারার উপায় কী! তুই ছিলি ওর সঙ্গী, তা তুই তো—

মিনি (কথা কেড়ে নিয়ে)। সে-জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, সঙ্গী ও নিজেই খুঁজে নিয়েছে।

অরিন্দম। নিয়েছে নাকি?

মিনি। ওর বেরুনো আর কিছুই না—ঐ নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করার ফিকির। (মিনির স্বর এত তীব্র হ'লো যে কথাটা শেষ ক'রে সে হাঁপাতে লাগলো)।

অরিন্দম (একটু অবাক হ'য়ে)। কেন, নিরঞ্জনের সঙ্গে বাড়িতেই তো ওর দেখা হ'তে পারে। হচ্ছিলোও তো।

মিনি। একটা জায়গা ঠিক ক'রে নেয়—তারপর দু'জনেই সেখানে গিয়ে জোটে। একেবারে বিলেতি নভেল! (নভেল কথাটায় মিনি অনেকখানি ঘৃণা ঢেলে দিলে)। এ-সব কি ভালো হচ্ছে?

অরিন্দম। হয়-তো ওরা একসঙ্গে সিনেমায় যায়-টায়—কী বলিস?

মিনি। নিশ্চয়ই। সিনেমায় তো যায়ই—আর কোথায় যায়, কী করে, ওরাই জানে। এর একটা বিহিত তোমাকে আজই করতে হবে, বাবা। তুমি জানো না, নিরঞ্জন কী ভয়ানক খারাপ লোক—বুলির সর্বনাশ না-ক'রে ও ছাড়বে না।

অরিন্দম। তাহ'লে তো ভাবনার কথাই হ'লো। তুই কী করতে বলিস?

মিনি। বুলিকে ডেকে ব'লে দাও যে নিরঞ্জনের সঙ্গে ও আর কোনোদিন দেখা করতে পারবে না।

অরিন্দম (মিনির মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে)। যদি বুলি না শোনে?

মিনি। শুনবে না! শুনতেই হবে ওকে!

অরিন্দম। তুই কি আমার সব কথা শুনিস?

মিনি। আমি তো অন্যায় কিছু করিনে।

অরিন্দম। বুলিও মনে করতে পারে যে সে কিছু অন্যায় করছে না।

মিনি। ওর কথাই তুমি মেনে নেবে নাকি? ঐটুকু মেয়ে—কী বোঝে ও?

অরিন্দম। তোর কাছে ও ঐটুকু মেয়ে—আমার কাছে তোরা দু'জনেই সমান। দু'জনেই ছোটো—দু'জনেই বড়ো।

মিনি। তাহ'লে এই অন্যায়ের তুমি প্রশ্রয় দেবে, বাবা?

অরিন্দম। তা দিতেই হবে। অত বড়ো মেয়ে—তাকে সামলাবো কেমন ক'রে।

মিনি। জোর ক'রে।

অরিন্দম। হাত-পা বেঁধে রাখবো?

মিনি। দরকার হ'লে তা-ই রাখবে।

অরিন্দম (একটু চুপ ক'রে থেকে)। তার চেয়েও ভালো উপায় একটা আছে, মিনি।

মিনি। কী সেটা?

অরিন্দম। ভাবছি, ওর বিয়েই দিয়ে দিই। তাহ'লেই নিশ্চিন্ত।

মিনি। ও, এই উপায় তুমি ভেবেছো।

অরিন্দম। কেন, এটা তোর পছন্দ হয় না?

মিনি। আমার পছন্দ-অপছন্দে কী এসে যায়?

অরিন্দম। তুই বড়ো বোন—তোর আগে তো আর ওর বিয়ে হ'তে পারে না।

মিনি। বাবা, তুমি বলছো কী!

অরিন্দম। তার মানে? তুই বিয়ে করবি না?

মিনি। না।

অরিন্দম। কোনোদিন না?

মিনি। কোনোদিন না।

অরিন্দম। বলিস কী? সারাজীবন বিয়ে না-ক'রে কাটাবি?

মিনি। সারা জীবন। ও-সব ভাবতে পর্যন্ত আমার ঘেন্না করে।

অরিন্দম। ঘেন্না করে! ও, মহামায়ার ইশকুলে তোমার এই শিক্ষা হচ্ছে বুঝি?

মিনি। বাবা!

অরিন্দম। আমি বলছি, বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।

মিনি। জোর ক'রে বিয়ে দেবে, বাবা?

অরিন্দম। হ্যাঁ, জোর ক'রে। দরকার হ'লে হাত-পা বেঁধে।

মিনি। ও, তোমার সব শাসন বুঝি আমার জন্তেই জমা রেখেছিলে? তোমার অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে দাদার জীবনটা নষ্ট হ'লো, এবার তোমার প্রশ্রয়েই বুলির যাতে সর্বনাশ না হয়, সেদিকে মন দাও—আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। (বেগে বেরিয়ে গেলো।)

[অরিন্দমের মুখ লাল হ'য়ে উঠলো, দু'হাতের মুঠি চেপে ধরলেন, জিভ দিয়ে নিচের ঠোঁট ভিজিয়ে নিলেন। স্তব্ধ হ'য়ে একটু দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর মাথা নিচু ক'রে আস্তে-আস্তে বাড়ির ভিতরে চ'লে গেলেন।

একটু পরে বাইরের দরজার কাছে পা টিপে-টিপে বুলি এসে দাঁড়ালো। ঘরের ভিতরে উঁকি দিয়ে সে যখন দেখলো ঘরে কেউ নেই, পিছন দিকে হাত তুলে ইঙ্গিত করলো। নিরঞ্জন এগিয়ে এলো। তারপর দু'জনে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলো।]

বুলি (চুপে-চুপে)। বোসো একটু। (নিরঞ্জন বসলো) ভাগ্যিশ তোমার সঙ্গে ট্র্যামে ওঠবার আগেই দেখা হ'য়ে গেলো।

নিরঞ্জন। তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চলতি ট্র্যাম থেকেই প্রায় লাফিয়ে পড়েছিলুম।

বুলি। ভালো করোনি। আর-একটু হ'লেই একটা কাণ্ড হ'তো। কী ব'লেই বা বেরিয়েছিলে তুমি?

নিরঞ্জন। খেয়ে-দেয়ে উঠে আইঢাই ক'রে সময় আর কাটে না।—

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। মনে হ'লো, যদি আধ ঘণ্টা আগে তোমার সঙ্গে দেখা হয়, সেই আধ ঘণ্টাই লাভ।

বুলি। কিন্তু এসে যদি দেখতে আমি বেরিয়ে গিয়েছি?

নিরঞ্জন। ভেবেছিলুম তুমি বেরোবার আগেই পৌঁছতে পারবোই। তুমিও তো অনেকটা আগেই বেরিয়ে পড়েছিলে।

বুলি। থাকগে, এ-রকম আর কোরো না। ঠিক সময়ে মেট্রোর সামনে দাঁড়িয়ে থেকো, তাহ'লেই হবে। আমাদের বাড়িটা তোমার পক্ষে আরামের জায়গা আর নয়, তা তো জানো। (ভিতরের দরজার দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে) কেউ যদি এসে পড়ে…

নিরঞ্জন। তাহ'লে চলো বেরিয়ে পড়া যাক।

বুলি। এক মিনিট বোসো। ঈশ্, একেবারে লাল হ'য়ে গেছো রোদ্দুরে।

নিরঞ্জন (রুমাল বের ক'রে মুখ মুছে)। এ আর কী। বর্মা গিয়ে তো সারাদিন রোদ্দুরেই দাঁড়িয়ে থাকা।

বুলি। সত্যি তুমি রোববারই যাচ্ছো?

নিরঞ্জন। যেতেই হবে।

বুলি। (ভাঙা-ভাঙা গলায়)। আর মোটে চার দিন! (হঠাৎ নিরঞ্জনের হাত চেপে ধ'রে) না, যেয়ো না।

নিরঞ্জন। ভয় কী! ফিরে আসবো।

বুলি (বিহ্বলের মতো)। না, তুমি যেয়ো না। আমি পারবো না—আমি আর পারি না। (নিরঞ্জনের হাত নিজের মুখের উপর রাখলো।)

নিরঞ্জন (আস্তে হাত সরিয়ে নিয়ে)। অমন কোরো না, বুলি। আমাকে দুর্বল ক'রে দিয়ো না।

বুলি। আমাকে নিয়ে চলো তোমার সঙ্গে।

নিরঞ্জন (আস্তে)। পাগল!

বুলি। তুমি কিছু ভেবো না—আমি বাবাকে বলবো—আজই বলবো—এই চারদিনের মধ্যেই সব ব্যবস্থা হ'য়ে যাবে—তারপর তুমি আমি ভেসে পড়বো একসঙ্গেই।

নিরঞ্জন। না—না—এখন কিছু বোলো না। সামনের বছর আবার আসবো, তখন—

বুলি। সা-ম-নে-র ব-ছ-র! সে যে অনেকদিন! না, আমি আজ রাত্রেই বাবাকে বলবো—তারপর কাল সকালে তুমি একবার এসো। তখনই সব ঠিক করা যাবে।

নিরঞ্জন। তোমার বাবার যদি মত না হয়?

বুলি। পাগল নাকি! আমার বাবা কি অন্যদের মতো? তাঁর মতো মানুষ হয় না। তাহ'লে এই ঠিক হ'লো?

নিরঞ্জন। তুমি বুঝছো না, বুলি। আমি যেখানে যাচ্ছি সেটা ঘোর অরণ্য। সেখানে তোমাকে নিয়ে যাওয়া? অসম্ভব?

বুলি। কষ্ট করবে তুমি একা, আর সুখের ভাগ নিতে ডাকবে বুঝি আমাকে? এত কাপুরুষ তুমি!

নিরঞ্জন। আমি কাপুরুষ! কত সাহস আমার, তোমাকে ফেলে চ'লে যাচ্ছি! আমি ঠিক ফিরে আসবো। তুমি—তুমি ভুলো না।

[অকস্মাৎ দ্রুতবেগে মিনির প্রবেশ। তার চেহারা উদ্‌ভ্রান্ত, আঁচল স্খলিত, চুল উচ্ছৃঙ্খল। ছুটে এসে সে বুলির হাত চেপে ধরলো, বুলি চমকে তাকালো, কিন্তু চোখ সরিয়ে নিলে না। নিরঞ্জন একটু দূরে স'রে গিয়ে মূর্তির মতো স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।]

মিনি (রুদ্ধস্বরে)। তাহ'লে এতদূর গড়িয়েছে?

বুলি (চুপ)।

মিনি। সইবে না, বুলি, সইবে না—

বুলি। মিনি—

মিনি। এখনো সময় আছে, এখনো তুই ওকে ছেড়ে দে। নয়তো···আমার এই কথা মনে ক'রে তোকে একদিন কাঁদতে হবে, বুলি! তোকে কাঁদতে হবে—এই আমি ব'লে দিলাম!

বুলি (ভাঙা-ভাঙা গলায়)। তুই আমাকে শাপ দিলি, মিনি!

মিনি। না—না—বুলি, লক্ষ্মী বোন আমার, এ আমি তোরই ভালোর জন্তে বলছি। পাছে তুই দুঃখ পাস, এই তো আমার ভয়। বুলি, বুলি, আমার কথা শোন, এত বড়ো কষ্ট আমাকে তুই দিসনে।

বুলি (হাত ছাড়িয়ে নিয়ে)। উপায় নেই, মিনি, এখন আর উপায় নেই।

মিনি। এই তোর শেষ কথা?

বুলি। এই আমার শেষ কথা। আর কথা বলবার সময়ও নেই আমার। (নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে) চলো।

[বুলি হনহন ক'রে বেরিয়ে গেলো, নিরঞ্জন আস্তে-আস্তে তার অনুসরণ করলে।]

মিনি (তাদের চ'লে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে—আর্তস্বরে)। বুলি! বুলি! তুই আমাকে মেরে ফেললি।

(দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো)

যবনিকা

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সেই রাত্রি। রাত প্রায় এগারোটা। হৈমন্তীর শোবার ঘর আর বারান্দায় অরিন্দমের বিছানা পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে। অরিন্দম তাঁর বিছানায় আধো শোয়া অবস্থায় সিগারেট খাচ্ছেন। বুলি এসে পাশে দাঁড়ালো। তার পরনের কাপড় আর চুল বাঁধা দেখে বোঝা যায় যে সে শুতে যাচ্ছিলো।]

অরিন্দম। এখনো জেগে আছিস, বুলি?

বুলি। তোমার সঙ্গে কথা আছে, বাবা।

অরিন্দম। বোস।

(বুলি একটা নিচু মোড়ায় বাবার গা ঘেঁসে বসলো।)

বুলি (একটু চুপ ক'রে থেকে)। আজ বৌদির চিঠি এসেছে, বাবা। চিঠি তো নয়, কেবল কান্না।

অরিন্দম। কান্না ছাড়া ওর আছেই বা কী?

বুলি (আস্তে একটু হেসে)। দাদাই বা কেমন! একখানা চিঠিও বোধ হয় লেখেনি বৌদিকে।

অরিন্দম। তোর দাদার বিষয়ে এখনো তুই মনে-মনে বেশ উচ্চাশা পোষণ করিস দেখছি।

বুলি। একবার গেলেও তো পারে বৌদির কাছে। এখানে তো কোনো কাজ নেই দাদার। তা তো নয়—রোজ ঐ মায়ামালঞ্চে গিয়ে প'ড়ে থাকবে।

অরিন্দম। কী বললি?

বুলি। বাঃ, তুমি জানো না, বাবা? দাদাও যে আজকাল মহা ভক্ত হ'য়ে উঠেছে।

অরিন্দম। আমি যে কত কম জানি তা ভেবে নিজেরই এক-এক সময় অবাক লাগে। তা খোকাও ভক্ত হ'য়ে উঠলো! বেশ, বেশ।

বুলি। বাবা, এবার তোমার ছুটিটাই মাটি হ'লো।

অরিন্দম। কেন বল্ তো?

বুলি। এসে তো শুধু অশান্তিই ভোগ করলে। যা-ই বলো, বাবা, মা বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছেন।

অরিন্দম। তাঁর যে বাড়াবাড়িরই ধাত।

বুলি (হেসে)। ঐ তোমার দোষ, বাবা, মা-র দোষ তুমি একেবারে দেখতে চাও না।

অরিন্দম। ও-বিষয়ে আমার একটা স্বাভাবিক অক্ষমতাই আছে, বুলি, কারুর দোষই সহজে চোখে পড়ে না। এই যে তুই এত বড়ো একটা অন্যায় ক'রে বেড়াচ্ছিস, তা নিয়েও কি আমি তোকে কিছু বলেছি?

বুলি (ত্রস্ত হয়ে)। বাবা, আমি অন্যায় ক'রে বেড়াচ্ছি!

অরিন্দম। মিনি আমাকে সব কথা বলেছে।

বুলি (তার মুখের রং বদলে গেলো)। ও, মিনি!

অরিন্দম। আচ্ছা, মিনির কী হয়েছে বল্ তো?

বুলি (মাথা নিচু ক'রে চুপ)।

অরিন্দম। ও যেন বড্ড চটেছে তোর উপর?

বুলি (মুখ তুলে)। বাবা, তোমাকে আমার যে-কথাটা বলবার ছিলো তা এখনো বলা হয়নি।

অরিন্দম। তুই নাকি সব সময় ঐ নিরঞ্জনের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করিস? সত্যি নাকি?

বুলি (ঢোঁক গিলে কী বলতে গেলো, বলতে পারলে না)।

অরিন্দম। তাহ'লে সত্যিই? এ তো ভালো নয়, বুলি?

বুলি। বাবা—(থেমে গেলো)

অরিন্দম। মিনি আবার নিরঞ্জনকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। আমার কিন্তু ওকে বেশ ভালোই লাগে। (বুলির মুখ হেসে উঠলো) কিন্তু বাইরে থেকে দেখে কি মানুষকে বোঝা যায়! হয়তো সত্যি ওর ভিতরে কিছু গোলমাল আছে। (বুলির মুখ ম্লান হ'য়ে গেলো।)

বুলি (একটু কেশে)। বাবা, আমার কথাটা শোনো—

অরিন্দম। আবার অনেক সময় কোনো অপরাধ না-ক'রেও বিশেষ-কোনো লোকের চোখে অপরাধী হ'তে হয়। এই ধর, মিনির যদি আজ বিয়ে হয়, তাহ'লে কি আর নিরঞ্জনকে ওর এত খারাপ লাগবে? আমার তো তা মনে হয় না। তুই কী বলিস?

বুলি। আমি বলছিলুম—(ঢোঁক গিলে চুপ ক'রে গেলো)

অরিন্দম। এই জন্যেই তো আমি মিনির বিয়ের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলুম। কিন্তু ও তো বলছে যে ও জীবনেই বিয়ে করবে না। কী পাগলামি বল দেখি।

বুলি (মাথা নিচু ক'রে চুপ)।

অরিন্দম। তা ওর না-হয় পরেই হবে, কিন্তু তোমার বিয়ে আমি এই শ্রাবণ মাসেই দেবো, এই ব'লে দিলাম। দেখো বাপু, তুমিও আবার ঢং-টং কোরো না যেন। আর হ্যাঁ—ও-সব বাইরে ঘুরে-টুরে বেড়ানো একদম বন্ধ, মনে থাকবে?

বুলি (অরিন্দমের কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে)। কাল সকালেই সে আসবে তোমার কাছে।

অরিন্দম। কে, নিরঞ্জন? কাল সকালেই আসবে? খুব ভোরে আসবে না তো?

বুলি। কাল খুব ভোরেই তোমাকে ডেকে দেবো, বাবা।

অরিন্দম। তাহ'লে তো তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হয়। যা, আর দেরি করিসনে।

বুলি। কিন্তু আমার সব কথা তো শুনলে না।

অরিন্দম (একটু চুপ ক'রে থেকে)। ভাবিসনে, নিরঞ্জনের সঙ্গেই তোর বিয়ে হবে। এখন যা, ঘুমো গে।

বুলি (দু'খানা হাত কোলের উপর জোড় ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে রইলো)।

অরিন্দম (মেয়ের কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে।) কিছু ভাবিসনে, যা।

[বুলি আবিষ্টের মতো আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালো।]

অরিন্দম। বুলি, শোন। (বালিশের তলা থেকে একটা বড়ো খাম বের করলেন।)

বুলি (বাবার বালিশের পাশে পিস্তল লক্ষ্য ক'রে)। বাবা, তুমি পিস্তল নিয়ে শোও কেন?

অরিন্দম। ও কিছু না, জঙ্গলে ঘুরে-ঘুরে ওটা একটা অভ্যেস হ'য়ে গেছে। ···শোন, একটা কথা তোকে বলা হয়নি।

বুলি। কী, বাবা?

অরিন্দম (খামের ভিতর থেকে একটা ভাজ-করা কাগজ বের ক'রে)। এই দ্যাখ, আমার উইল করেছি।

[একটু দূরে মুহূর্তের জন্য-অরুণকে দেখা গেলো]

তোদের দু'বোনকেই সব দিয়ে গেলুম। উজ্জ্বলার কিছু রইলো, আর বাড়িটা তোর মা-র—কে ওখানে?

[অরুণের মূর্তি স'রে গেলো]

বুলি (চারদিকে তাকিয়ে)। কই, কেউ না, বাবা।

অরিন্দম। কাকে যেন দেখলুম। একবার দেখে আয় তো, তোর মা বোধ হয় এলেন।

বুলি (একবার ঘুরে এসে)। না, বাবা। কেউ না।

তৃতীয় অঙ্ক

অরিন্দম। মনে হ'লো কাকে যেন দেখলুম। (খামের ভিতর থেকে কাগজ বের ক'রে) একবার দেখবি নাকি ?

বুলি। না, বাবা, ও আমি দেখে কী করবো।

অরিন্দম। তোর দাদা ভেবেছে বাপ মরলেই সে বড়োলোক হবে। তার সে-আশায় যে বাজ পড়লো, এ খবরটা তাকেও জানিয়ে দেয়া দরকার—কী বলিস ?

বুলি। এ-সব কথা আমাকে বলছো কেন, বাবা ?

অরিন্দম। কাকে আর বলবো ? এই আমার শেষ চেষ্টা—এই আঘাত পেয়ে ও যদি বদলায়, যদি মানুষ হতে শেখে। বুলি !

বুলি। বাবা।

অরিন্দম। নিরঞ্জনের বর্মা যাওয়া কিন্তু হবে না। বিয়ের পরেই জামাই যাবেন বিদেশে, আর মেয়ে মুখ মলিন ক'রে ডাকের আশায় ব'সে থাকবে, এ আমি হ'তে দেবো না।

বুলি। তুমি ওকে বোলো, বাবা।

অরিন্দম। ভাবিসনে ওকে আমি আমার উপর নির্ভর করতে বলছি। ও যে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী, সে-জন্যই তো ওকে আমার ভালো লাগে। ওর মতো একটা ছেলে আমারও তো থাকতে পারতো।

বুলি। বাবা, তুমি যখন মন-খারাপ করো আমি একেবারে সইতে পারিনে।

অরিন্দম (বুলির হাতে হাত রেখে)। না রে, আমি মন খারাপ করছি না। আজ আমার কী যে ভালো লাগছে তা তুই বুঝবিনে, বুলি। মনে হচ্ছে, আমার একটা জীবন যেন শেষ হ'য়ে গেলো, কাল থেকে নতুন জন্ম, নতুন জীবন। বুলি !

বুলি। বাবা !

অরিন্দম। বিয়ের পরে তোদের দু'জনকে নিয়ে নাগপুরে যাবো। মাসখানেক আমার কাছে থাকা চাই।

বুলি। তোমার যা ইচ্ছে তা-ই হবে, বাবা।

অরিন্দম। না-হয় প্রথমে তোরা পাঁচমারি পাহাড়ে যেতে পারিস—এদিকে তোর মা ঘর-বাড়ি গুছিয়ে রাখবেন—নাগপুরের বাড়িটার যা অবস্থা হ'য়ে আছে!

বুলি। মা কি যেতে চাইবেন, বাবা?

অরিন্দম। চাইবেন না! বলিস কী! জামাইকে দেখে মা-মহামায়াকে ভুলবেন তিনি!…অনেক রাত হ'লো বুলি। এখন যা, শুয়ে পড়গে। (বুলি চুপ ক'রে একটু দাঁড়িয়ে রইলো)

অরিন্দম (একটু হেসে)। আজ আর তোর ঘুম হবে না, না রে? দেখিস, আমাকে আবার রাত থাকতেই ডেকে তুলিসনে।

[বুলি উঠে দাঁড়ালো। অরিন্দম মেয়ের মাথায় একবার হাত রাখলেন।]

বুলি। আলোটা নিবিয়ে দেবো, বাবা?

অরিন্দম। দে।

[বুলি আলো নিবিয়ে দিয়ে আস্তে-আস্তে চ'লে গেলো। অস্পষ্ট নীল আলোয় দেখা গেলো অরিন্দম শোবার উদ্যোগ করছেন। উইলটা খামের ভিতর ভ'রে সযত্নে বালিশের তলায় রেখে শুয়ে পড়বেন এমন সময় হৈমন্তী নিঃশব্দ দ্রুত পায়ে বারান্দা পার হ'য়ে ঘরের দিকে যেতে লাগলেন।]

অরিন্দম (আধো শোয়া অবস্থায়)। মন্তী! (হৈমন্তী কথাটা শুনলেন না কিংবা না-শোনবার ভান করলেন)।

অরিন্দম। মন্তী, শোনো।

হৈমন্তী (দাঁড়িয়ে)। এখনো ঘুমোওনি?

অরিন্দম। ঘুমুতে যাচ্ছিলাম—তুমি যখন এলে, একটু পরেই ঘুমুবো। তুমি কি এইমাত্র ফিরলে?

হৈমন্তী (চুপ)।

অরিন্দম। একটু কাছে এসো, মন্তী। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

হৈমন্তী (একটু এগিয়ে এলেন)।

অরিন্দম (নিজের বিছানায় জায়গা দেখিয়ে)। বোসো। (হৈমন্তী শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন) বোসো না একটু।

হৈমন্তী। আমার এখন সময় নেই।

অরিন্দম (উঠে দাঁড়িয়ে)। কখনোই কি তোমার সময় হবে না, মন্তী? কেন তুমি এ-রকম পাগলামি করছো বলো তো? তুমি তো সেই মন্তীই আছো।

[অরিন্দম হৈমন্তীর হাত ধরবার জন্য হাত বাড়ালেন, হৈমন্তী সভয়ে দু'পা পিছিয়ে গেলেন।]

অরিন্দম। তুমি ভাবছো আমি তোমার উপর রাগ ক'রে তোমাকে জিতিয়ে দেবো? না, মন্তী, না। আর ছেলেমানষি কোরো না। এসো।

হৈমন্তী। অন্য-কোনো কথা আছে?

অরিন্দম। তাও আছে দু'একটা। আমি একটা উইল করেছি, সে-কথা তোমাকে বলা হয়নি। কখন বলবো—তোমার সঙ্গে দেখাই হয় না। রাত্তিরে যখন বাড়ি ফেরো তার আগে রোজই তো আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

হৈমন্তী। এই কথা?

অরিন্দম। কী উইল করেছি শুনবে না?

হৈমন্তী। না। যা খুশি করো। আমার তাতে কী?

অরিন্দম। তোমার তাতে কী! (হেসে) তুমি মন্তী যে! মন্তী, তোমার অভিমান এখনো কি ভাঙেনি?

হৈমন্তী (চুপ)।

অরিন্দম। তোমার মান ভাঙানো যে কত কঠিন তা আমি তো জানি। বার-বার তোমার কাছে আমারই হার হয়েছে, এবারও তা-ই হ'লো। আমাকে ক্ষমা করো, মন্তী। এসো, কাছে এসো। এইমাত্র ঠিক করলাম বুলির সঙ্গে নিরঞ্জনের বিয়ে দেবো। মন্তী, আজকের দিনে তুমি মুখ ফিরিয়ে থেকো না।

হৈমন্তী। তুমি আমাকে আর মন্তী ব'লে ডেকো না।

অরিন্দম। মন্তী ব'লে ডাকবো না?

হৈমন্তী। না, মনে রেখো আমি আর তোমার স্ত্রী নই।

অরিন্দম। মন্তী!

হৈমন্তী (উপরের দিকে হাত তুলে)। পৃথিবীর সকল নারীর যিনি স্বামী, তিনিই আমার স্বামী। তাছাড়া আমার স্বামী নেই। (দ্রুতবেগে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।)

অরিন্দম। মন্তী, মন্তী! (তাকিয়ে দেখলেন হৈমন্তী চ'লে গেছেন।)

অরিন্দম। (মৃদুস্বরে)। মন্তী।

[অরিন্দম মাথা নিচু ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে বসলেন বিছানার ধারটিতে। রঙ্গমঞ্চের আলো আস্তে-আস্তে ক'মে এসে একেবারে অন্ধকার হ'য়ে গেলো। একটু পরে আবার আবছা-নীল আলো জ্ব'লে উঠতে দেখা গেলো অরিন্দম কপালে হাত রেখে ঘুমোচ্ছেন। নিঃশব্দে, খুব সাবধানে অরুণ এসে ঢুকলো। পা টিপে-টিপে অরিন্দমের বিছানার কাছে এগিয়ে এলো, লক্ষ্য ক'রে দেখলো অরিন্দম ঠিকই ঘুমুচ্ছে কিনা। তারপর আস্তে বালিশের তলায় হাত দিয়ে উইলের খামটা বের ক'রে আনলো। খামের ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখলো ঠিক কাগজটাই আছে কিনা। তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলো।

অরুণের চ'লে যাবার শব্দে অরিন্দম জেগে উঠলেন। তাঁর মুখে কী রকম একটা উদ্বেগের ছায়া। হঠাৎ কী মনে হ'লো, বালিশের তলায় হাত হাত দিলেন। বালিশ, বিছানা, আশে-পাশের মেঝে খুঁজে দেখলেন—

কিছুই পাওয়া গেলো না। তাঁর কপালে ঘাম ফুটে উঠলো। অভ্যাস-মতো পিস্তলটা হাতে নিয়ে ছুটে রেলিঙের ধারে গিয়ে একটু দাঁড়ালেন, মুখ বাড়িয়ে নিচের দিকে তাকালেন, তারপর ফিরে এলেন বিছানার ধারে।

একটু দাঁড়িয়ে কী চিন্তা করলেন। তারপর দ্রুত পায়ে পিস্তল হাতে নিয়েই যেতে লাগলেন হৈমন্তীর ঘরের দিকে। পরদা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। ঘর অন্ধকার। আবছা দেখা যাচ্ছে হৈমন্তী খাটে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন।]

অরিন্দম (তীব্র চাপা গলায়)। মন্তী, মন্তী!

[হৈমন্তীর ঘুম ভাঙলো। শিয়রের ধারে ছোটো টেবিলে পিস্তলটা রেখে অরিন্দম দেয়াল হাৎড়ে সুইচ টিপলেন। ঘরে আলো জ্ব'লে উঠলো।]

অরিন্দম (এগিয়ে গিয়ে হৈমন্তীর বাহুতে ঠেলা দিয়ে)। মন্তা!

[হৈমন্তী চমকে চোখ মেললেন, সঙ্গে-সঙ্গে একটা অস্ফুট বিকৃত আওয়াজ তাঁর গলা দিয়ে বেরুলো।]

হৈমন্তী। তুমি—তুমি কী চাও?

অরিন্দম (হৈমন্তীর কপালে হাত রেখে—আশ্বাসের স্বরে)। মন্তী, আমি—আমি।

হৈমন্তী (তীব্র ঝাঁকুনিতে হাত সরিয়ে দিয়ে বিছানার উপর উঠে ব'সে, গলা-ছেঁড়া বুক-ফাটা স্বরে)। যাও এখান থেকে।

অরিন্দম। মন্তী, শোনো—

হৈমন্তী (চট ক'রে খাট থেকে নেমে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে-কাঁপতে)। যাও, এক্ষুনি যাও। (তাঁর চোখ গোল-গোল, মুখ আতঙ্কে কুৎসিত।)

অরিন্দম। মন্তী—আমার উইলটা খুঁজে পাচ্ছি না—

হৈমন্তী (ঘৃণায় শিউরে উঠে)। যাও।

অরিন্দম। (স্ত্রীর দিকে এগিয়ে)। মনে হচ্ছে বালিশের তলায় নিয়ে শুয়েছিলাম—হঠাৎ জেগে দেখি, নেই। আমি কি তোমাকে—

হৈমন্তী (চীৎকার ক'রে)। যাও এখান থেকে! যাও! (অন্ধের মতো চারদিকে হাৎড়াতে লাগলেন।)

অরিন্দম (স্ত্রীর দিকে হাত বাড়িয়ে)।—তোমাকে কি ওটা দিয়েছিলাম?

হৈমন্তী (আর্তস্বরে)। মূর্তিমান পাপ! মূর্তিমান পাপ! (খাটের শিয়রের টেবিল থেকে কী-একটা জিনিশ তুলে নিলেন।)

অরিন্দম (ব্যস্ত হ'য়ে)। করো কী, মন্তী, করো কী! ওটা রেখে দাও, ওটা আমার পিস্তল। হঠাৎ ছুটে গেলে—

[বলতে-বলতে অরিন্দম হৈমন্তীর হাতটা ধরতে গেলেন। একটু কাড়াকাড়ি হ'লো, তারপর প্রচণ্ড শব্দ। ধোঁয়ায় ঘর ভ'রে গেলো।]

অরিন্দম। মন্তী, এ তুমি করলে কী! (বুকে হাত চেপে খাটের উপর প'ড়ে গেলেন। হৈমন্তী বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর হাত থেকে পিস্তলটা খ'সে প'ড়ে গেলো। তারপর মর্মভেদী চীৎকার ক'রে স্বামীর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লেন।)

যবনিকা

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পূর্বদৃশ্যের দিন দশেক পরে। অরিন্দমের সেই ড্রয়িংরুম, কিন্তু সে-ঘর আর চেনবার উপায় নেই। আগেকার জিনিশপত্র সব সরানো হ'য়ে গে'ছে। মস্ত মেঝেতে ফরাশ বিছোনো। এক প্রান্তে ফরাশের উপর গালিচা পাতা। সেখানে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ, ফুলের মালা ও রঙিন ইলেটিক বল্‌বে বিভূষিত। এক পাশে খোল করতাল হার্মোনিয়ম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র প'ড়ে আছে।

অরুণ আর মহামায়া পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। অরুণের পরনে খাটো কোরা ধুতি, হাতে কুশাসন, মুখ দাড়ি-গোঁফে আচ্ছন্ন। বাপের জন্য জাঁকিয়ে শোক করছে। হবিষ্যান্ন খেয়ে-খেয়ে সে এ-ক'দিনে আরো যেন মোটা হয়েছে, দাড়িগোঁফ ভেদ ক'রে তার মুখমণ্ডলে নব-লব্ধ কর্তৃত্বের স্ফীত রূঢ় ভাবটা সুস্পষ্ট।

মহামায়া আজ শ্রীরাধিকা সেজেছেন। টকটকে লাল সাটিনের ঘাঘরা পরনে, গায়ে হলদে রঙের খাটো রেশমি জামা, তার তলায় দেখা যাচ্ছে কাঁচুলির গোলাপি আভা। হাতে তাঁর লীলাকমল, ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসি। অসামান্য সুন্দরী দেখাচ্ছে।

যবনিকা যখন উঠলো, অরুণ মহামায়ার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে এই কথাটাই বোধ হয় ভাবছিলো।]

অরুণ। তুমি ওগুলোই প'রে থাকবে নাকি?

মহামায়া (একটু স'রে গিয়ে)। তোর চোখে ভালো না লাগে, দেখতে হবে না। গাড়ি ডেকে দে, বাড়ি যাই।

অরুণ। বাড়ি। এটা কি তোমার বাড়ি নয়?

মহামায়া। কোনো বাড়িই আমার বাড়ি নয়, অরুণ।

অরুণ। কেন, তোমার মায়া-মালঞ্চ?

মহামায়া। মায়া-মালঞ্চ কি বিশেষ-একটা বাড়ি? সমস্ত পৃথিবীই যে তা-ই।

অরুণ। তাই যদি হয়, তাহ'লে আমার এই বাড়িকেও মায়া-মালঞ্চ ব'লে ভাবতে পারো না কেন?

দ্বিতীয় দৃশ্য

মহামায়া। পারি না কে বললে ? তা ভাবি ব'লেই তো রোজ কেত্তনের দল নিয়ে এখানে আসি।

অরুণ। রোজ আসো—রোজই আবার চ'লে যাও।

মহামায়া। তবে কি আমাকে এখানে থাকতে বলিস নাকি ?

অরুণ। মাঝে-মাঝে না-হয় থাকলেই।

মহামায়া। কিন্তু অত লোকজনের ভিড়ে তোদের কি সুবিধে হবে ?

অরুণ। আমরা আর কে—তোমারই সব ! বাড়িতে আর লোকই বা কোথায়—মিনি মা-কে নিয়ে একটা ঘরে থাকবে—তাছাড়া সমস্ত বাড়িটাই তোমার ব'লে ভেবে নাও।

মহামায়া। তুই আমাকে মিথ্যা ভাবতে বলিস ?

অরুণ। মিথ্যা কেন হবে ? (অভিমানের সুরে) তোমাকে আর কতবার বলবো যে এ-বাড়ি তোমারই ?

মহামায়া (খিলখিল ক'রে হেসে উঠে)। এ-সব পাগলামি তোর মাথায় কে ঢোকায় বল তো ? দেবতাকে দিলে আর যে ফিরিয়ে নেয়া যায় না, জানিস ?

অরুণ (প্রায় ধরা গলায়)। আমি কি চাচ্ছি ফিরিয়ে নিতে ? আমার যা আছে সবই যে তোমার এ-কথা এখনো মেনে নিচ্ছো না কেন ? কেন এখনো দূরে ঠেলে রেখে আমাকে কষ্ট দাও ?

মহামায়া (মধুর হেসে)। তোর ভক্তি দেখে আমিই এক-এক সময় অবাক হ'য়ে যাই। বড়ো না ভেবেছিলি তুই একটা বিরাট দস্যু, এখন দেখলি তো ! তিনি যখন ডাকলেন, কিছুই হাতে রাখতে পারলি না—সব দিতে হ'লো।

অরুণ। তিনি ?···না, না, তিনি-টিনি কেউ নয়—তুমি, তুমি। সব যাকে দিতে পারি সে তুমি ছাড়া আর-কেউ নয়।

মহামায়া। আমার ভিতর দিয়েও তিনিই যে কাজ করছেন।

আজ শুনলি না কেত্তন—(গুনগুন ক'রে গেয়ে) প্রভু, আমারে তোমার আধার করো, গোপনে নিভৃতে তোমারি অমৃতে তনু-মন মম সকলি ভরো।

অরুণ (মনে-মনে মুগ্ধ হ'য়ে)। আজ গান বড়ো সুন্দর হয়েছিলো।

মহামায়া। গান বলিসনে, পূজা। তোর বাবার শ্রাদ্ধ-শান্তি না হওয়া পর্যন্ত এই যে রোজ সন্ধ্যায় কীর্তনের ব্যবস্থা করেছিস, এটা খুব ভালো হয়েছে। মহাপ্রাণ পুরুষ ছিলেন তিনি—তাঁর আত্মার তৃপ্তি-সাধন কি সোজা!

অরুণ। তুমি জানতে যে এ-রকম হবে?

মহামায়া। জানতুম বলতে পারিনে, তবে কী-রকম মনে হয়েছিলো তোকে তো বলেছি।

অরুণ। তারপর থেকে আমারও মনে হ'তে লাগলো বাবার মুখের ভাব যেন অস্বাভাবিক। আড়াল থেকে তাঁকে লক্ষ্য করতুম। তারপর সেই রাত্তিরে—

মহামায়া (স্নিগ্ধস্বরে)। বল্।

অরুণ। তুমি তো জানোই।

মহামায়া। যথার্থ পুত্রের কাজ করেছিস, অরুণ, তাঁর আত্মাকে নরক-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করেছিস। পুত্রকে বঞ্চিত করা কি সোজা কথা! ও যে মহাপাপ। কী মনে ক'রে ও-রকম করেছিলেন কে জানে। বেঁচে থাকলে নিজেই দু'দিন পরে ওতে আগুন দিতেন।

অরুণ। তাঁর হয়ে ও-কাজটা আমিই করেছি।

মহামায়া। ওটা পুড়িয়ে ফেলেছিস?

অরুণ। তক্ষুনি। আর-কেউ দ্যাখেনি।

মহামায়া। আর-কেউ জানেও না?

অরুণ। শেষ মুহূর্তে বাবা বোধ হয় চেয়েছিলেন মা-কে বলতে।

ভালো ক'রে কিছুই বলতে পারেননি ; কথা জড়িয়ে আসছিলো। তাছাড়া মা তো প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই—

মহামায়া (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে)। আঃ! হৈমন্তীর কথা ভাবতে বুক ফেটে যায়।

অরুণ। তোমার কী মনে হয়? সারবে?

মহামায়া (চিন্তিত স্বরে)। অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছি তাঁকে, তিনি তো কিছু বলেন না।

অরুণ। সত্যি তুমি কৃষ্ণকে দেখতে পাও?

মহামায়া। তাঁকে দেখতে না-পেলে কি বাঁচতুম! তবে মাঝে-মাঝে অভিমান করেন, মুখ ফিরিয়ে থাকেন, তখন বড়ো কষ্ট হয়।

অরুণ। তাহ'লে তোমার মনে হয় এ আর ভাল হবার নয়?

মহামায়া (একটু চুপ ক'রে থেকে)। আসল কথাটা কী, জানিস? ওর আত্মা এখনো পবিত্র হয়নি, ভিতরে চাপা ছিলো বাসনা, কামনা। নয়তো ওর মতো ভক্তিমতীর এমন দুর্দশা হবে কেন? জানিস তো, সত্যিই যে ভক্ত তার কোনোদিন সামান্য অসুখও করে না?

অরুণ। কোনোদিন না? ধরো, তার শরীরে যদি আগেই কোনো রোগের বীজাণু ঢুকে থাকে?

মহামায়া। তাও সেরে যায়।

অরুণ ('সব' কথাটায় বিশেষ একটু জোর দিয়ে)। সব অসুখ সারে?

মহামায়া। রোগ একটাই, এক-এক অবস্থায় এক-এক চেহারা নিয়ে দেখা দেয়। তাঁকে ভুলে' থাকি, তাঁকে হারিয়ে ফেলি, মানুষের এটাই তো ব্যাধি। এ-কথা যারা বোঝে না তারাই বলে এটা জ্বর, ওটা যক্ষ্মা, সেটা পিত্তশূল। তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারিস যদি, মূল ব্যাধিই

সারে, ছোটো-ছোটোগুলোর জন্য তাই আর ভাবতে হয় না।

অরুণ (গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে)। তোমার কথা শুনে মনে ভারি আরাম পেলাম। তাহ'লে মা-কে—

মহামায়া। ভাবিসনে, তোর মা-রও মুক্তি হবে।

অরুণ। কবে?

মহামায়া। সে-কথা কেমন ক'রে বলি?

অরুণ (আবদারের সুরে)। না, না তুমি যা-হোক একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও। এ-ভাবে মা যদি বেশিদিন বেঁচে থাকেন সেটা কারো পক্ষেই সুখের হবে না। বাবার সঙ্গে এখন তাঁর পুনর্মিলন হ'লেই তো ভালো হয়।

মহামায়া। ছি, ও-কথা মনে আনতে নেই।···আচ্ছা ছাখ, সত্যি কি তোর মা-ই—।

অরুণ। কিছুই বুঝলুম না। তবে ডাক্তারের কাছে বাবা নিজের মুখেই ব'লে গিয়েছিলেন যে পিস্তল সাফ করতে গিয়ে তাঁর বুকে গুলি লেগেছিলো। কেউ কোনো সন্দেহ করেনি—কেনই বা করবে? যা-ই বলো, মরতে-মরতেও বাবা বেশ সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে গেছেন। (অরুণের দাড়ি-গোঁফ-ঢাকা মুখে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো) এত সব হাঙ্গামার উপর আবার পুলিশের হাঙ্গামা হ'লেই হয়েছিলো আরকি।

মহামায়া। এত ভালোবাসতেন তিনি তোদের—তোদের কোনো বিপদে ফেলে তিনি কি যেতে পারেন!

[হৈমন্তীর আর মিনির প্রবেশ। হৈমন্তীর পরনে মহামূল্য বেনারসি, সর্বাঙ্গে অলংকার। মিনির পরনে সরু পাড়ের ধুতি, গায়ে মোটা শাদা জামা, তার লম্বা কালো চুল সে ছেঁটে ফেলেছে। তার মুখের ভাব বাস্তবিকই তপঃক্লিষ্টা সন্ন্যাসিনীর মতো।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরুণ (গর্জন ক'রে উঠে)। মা-কে এখানে নিয়ে এসেছিস যে, মিনি? তোকে না ব'লে দিয়েছি ঘরের বাইরে তাঁকে কখনো আসতে দিবি না?

মিনি (করুণ ক্লান্ত সুরে)। রাখতে পারলুম না, চ'লে এলেন।

হৈমন্তী (মহামায়ার মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে)। তুমি কে গা? বাঃ, ভারি ফুটফুটে তো মুখখানা! আর বেশভূষার কী বাহার! আ—হা! কে তুমি?

মহামায়া। আমাকে চিনতে পারছো না?

হৈমন্তী। ও, বুঝেছি। মিনি, এই বুঝি তোর নতুন মা? বেশ, বেশ। ভারি সুন্দর বৌ হয়েছে। তা বাছা শোনো, একটা কথা বলি। স্বামী খেতে খুব ভালোবাসেন—ভালো ক'রে নিজের হাতে রান্না-বান্না কোরো—চাকরের হাতে সব ছেড়ে দিয়ো না। আহা—ঐ বিদেশে একা প'ড়ে থাকেন—কত যেন কষ্ট হয়—এবার তুমি এলে, ভালোই হ'লো। আমি তো একটা অভাগী—আমাকে তিনি ত্যাগ করেছেন—পায়ে ধ'রে বললুম, আমাকে নিয়ে চলো তোমার সঙ্গে, আমাকে ফেলে যেয়ো না, তা তো শুনলেন না— (ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন)

মিনি মা, চুপ করো তুমি।

হৈমন্তী (অরুণের দিকে ফিরে)। আপনি কে? আপনাকে যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। (অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে) ও—ও, তুই খোকা! তা তুই আবার দাড়ি রাখছিস কবে থেকে? ছি-ছি, লোকে দেখে ভাববে কী! যা, এক্ষুনি কামিয়ে ফ্যাল গিয়ে, ভদ্রলোকের মতো কাপড়চোপড় প'রে আয়। তুই কি ভাবছিস তোর মা ম'রে গিয়েছে? (হেসে উঠে) কী কাণ্ড! আমার খুব অসুখ করেছিলো···ওঃ, মাথায় কী যন্ত্রণা! কিন্তু ম'রে যাওয়া কি সোজা! আর আমি ম'রে গেলেও

তোরা তো মাতৃহীন হবি না—এই তো তোর বাবা কেমন ফুটফুটে টুকটুকে নতুন মা এনে দিয়েছেন তোদের। ...(অরুণের খুব কাছে এসে, চুপি-চুপি গলায়) শোন একটা কথা—বুলি কোথায় ? তাকে দেখছি না ?

মিনি (রুদ্ধস্বরে)। চলো, মা।

হৈমন্তী। মিনি, তোরই বা কী বিচ্ছিরি হাল। হয়েছে কী তোদের ? আজ এমন একটা আনন্দের দিন, তোদের নতুন মা ঘরে এলেন, আর তোরা কিনা লক্ষ্মীছাড়া চেহারা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। আমাকে স্থাখ তো, কেমন সুন্দর শাড়ি পরেছি—ওগো ছোটো বৌ, আজ তোমাকে দেখে আমার একটি দিনের কথা মনে পড়ছে—নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো কোন দিন।

মিনি। মা, আর কথা বোলো না—তোমার তো অসুখ—উপরে চলো।

হৈমন্তী। আমাদের সময় তো তোমাদের মতো এত চটকদার ফ্যাশন ছিলো না—ত্যাখো, এই শাড়িটি প'রেই আমার বিয়ে হয়েছিলো। এই শাড়িটির 'পরেই বা তাঁর কত মমতা। ওলো ছোটো বৌ, সাবধান থাকিস, সাবধান থাকিস, পুরুষের মন বড়ো অস্থির।

অরুণ। মা-কে নিয়ে যা না, মিনি !

হৈমন্তী। খোকা, তুই আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিস ! তোর নতুন মা এই পরামর্শ দিয়েছে বুঝি তোকে ! এ বাড়ি আমার, তা মনে রাখিস। ইচ্ছে করলে আমিই তোকে ঘাড়ে ধ'রে বের ক'রে দিতে পারি। (অরুণ হেসে উঠলো) কী, কথা বুঝি কানে যাচ্ছে না ! বললি না বুলি কোথায় ?

অরুণ। নাঃ, জোর ক'রেই ধ'রে নিয়ে যেতে হবে দেখছি।

হৈমন্তী। বুঝেছি, তোরাই বুলিকে লুকিয়েছিস। সে ছোটো

ব'লে তার উপর জুলুম চলছে। নিরঞ্জনের সঙ্গে তার বিয়ে হ'তে দিবিনে বুঝি তোরা? ওরে বোকারা, তোদের বাবাই যে এ-বিয়ে ঠিক করেছেন—এ বিয়ে হবেই। তোরা যদি বাধা দিতে আসিস, আমি আছি। আমি ওর মা না!

মিনি। চুপ করো, মা, চুপ করো।

হৈমন্তী। না, আমি চুপ করবো না, চুপ করবো না। বুলিকে তোরা কোথায় লুকিয়েছিস শিগগির বল। এই বাড়িতেই কোথাও সে আছে—তা ছাড়া আর কোথায় যাবে? আমি খুঁজে বের করবো—চীৎকার ক'রে ডাকবো তাকে—বুলি, কোথায় তুই? আয়, আয় আমার কাছে, তোর মা-র কাছে আয়—বুলি—বুলি—বুলি! (চীৎকার করতে-করতে বেরিয়ে গেলেন।)

অরুণ (মিনিকে)। হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? যা না মা-র সঙ্গে-সঙ্গে। কোথাও প'ড়ে-ট'ড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙলে ভোগান্তি হবে তো আমারই! যা!

মিনি (ক্ষীণস্বরে)। দাদা, তোমার রাত্তিরের খাবার—

অরুণ। আমি কিছু খাবো না। যা তুই।

[মিনি মাথা নিচু ক'রে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলো]

মহামায়া (একটু পরে)। ধন্য মেয়ে! এই বয়সেই তপস্বিনী হলো!

অরুণ। মিনির কথা বলছো? হ্যাঁ, মিনি তোমার কাছে এমন শিক্ষাই পেয়েছে যে দেখে অবাক হ'তে হয়। মুখ বুজে সারাদিন কাজ করে, দিনে রাত্রে একবার মাত্র খায়। আর ওরই বোন হ'য়ে বুলি কী কাণ্ডটাই করলে!

মহামায়া (একটু চুপ ক'রে থেকে)। ওর কোনো চিঠি পেয়েছিস।

অরুণ। নাঃ, চাইনে ওর চিঠি—ওর নাম যেন আমাকে আর কোনোদিন না শুনতে হয়! পাপিষ্ঠা!

মহামায়া। ছি, ও-রকম বলতে নেই।

অরুণ (ফুঁসে উঠে)। ওহ্, কী কলঙ্ক! আমাদের বংশের মানমর্যাদা সব গেলো। এই বাবা গেলেন—এত বড়ো একটা শোক—বাড়িতে হুলুস্থুল কাণ্ড—আর ও কিনা এরই মধ্যে চম্পট দিলে! শ্রাদ্ধটা হ'য়ে যাওয়া পর্যন্ত সবুর সইলো না! অথচ বাবা আমাদের মধ্যে ওকেই সবচেয়ে ভালোবাসতেন। কত বড়ো অকৃতজ্ঞ! বিবেক না থাক, দয়ামায়া তো থাকে মানুষের! এ-সব মেয়েকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাবকালে ঠিক হয়।

মহামায়া (নিঃশ্বাস ছেড়ে)। প্রবৃত্তির তাড়নায় কত দুর্গতিই মানুষের হয়।

অরুণ। এমন নির্লজ্জ, মিনির নামে আবার চিঠি লিখে রেখে গেছে, নিরঞ্জনকে বিয়ে ক'রে বর্মা যাচ্ছে। ছোঃ, ও আবার বিয়ে! (উত্তেজিতভাবে একটু পায়চারি ক'রে) তা ভালোই হয়েছে—গেছে, আপদ গেছে—রক্ষে পেয়েছি আমি। ও-রকম একটা দুশ্চরিত্র মেয়ে ঘরে থাকলেই বিপদ।

মহামায়া (একটু পরে)। উজ্জ্বলাকে আনাবি নাকি এখন?

অরুণ। না, অত সব ঝক্কি পোয়াতে পারবো না আমি। বেশ ভালোই তো আছে মা-বাবার কাছে। এখানে এসে করবেই বা কী? —হাঁা, ভালো কথা, শ্রাদ্ধের দিন তোমাকে কিন্তু সারাদিন এখানে থাকতে হবে।

মহামায়া। তুই দেখছি আমার উপর বড্ড বেশি জুলুম শুরু করলি।

অরুণ। করবো না! তুমি ছাড়া আমার এখন আছেই বা কে!··· আজ আর তুমি না ফিরলে। এখানেই থাকো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মহামায়া। এখানেই থাকবো!

অরুণ। হ্যাঁ, এখানেই থাকবে। (মহামায়ার ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠলো) হাসছো যে? আমার এই সামান্য অনুরোধটাও কি তুমি রাখতে পারো না?

মহামায়া। তুই কি একেবারে পাগল হয়ে গেলি?

অরুণ। পাগল হবো না? তোমাকে এই রাধিকার বেশে দেখে—

মহামায়া (লজ্জিতভাবে)। ওরা চায়, তাই এ-সব করতে হয়। ভালো লাগে না।

অরুণ (মহামায়ার মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে)। কেন, বেশ তো। আমার তো বেশ ভালোই লাগে। সত্যি মনে হয় তুমি শ্রীরাধিকা।

মহামায়া (আধো চোখ বুজে)। আমরা যা ভাবি সেটাই তো সত্য। তাছাড়া তো আর সত্য নেই।

অরুণ। চলো তোমাকে উপরের ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।

মহামায়া। আমি একাই যেতে পারবো।

অরুণ। না, না, সে কী হয়!

মহামায়া। আমি এখন নির্জনে ব'সে কৃষ্ণকে ডাকবো।

অরুণ। তিনি তোমাকে দেখা দেবেন? চলো, আমিও দেখবো কৃষ্ণকে।

মহামায়া। তুই তো তাঁকে দেখতে পাবিনে।

অরুণ। তাঁকে না দেখি, তোমাকে তো দেখবো। তোমাকে ছেড়ে একটুও যে থাকতে পারি না—কী করি বলো তো?

মহামায়া (হাতের পদ্মটি দিয়ে অরুণের দাড়ি-ভরা গালে মৃদু আঘাত ক'রে)। পাগলা!

যবনিকা